নীল নীলা

প্রভাস ভদ্র

নীল নীলা

সতেরটি ছোট গল্পের সংকলন

প্রভাস ভদ্র

লিপিকা

তিরিশ/এক-এ, কলেজ রো, কলকাতা-নয়

NEEL NEELA

a collection of short.stories

by PROVASH BHADRA

প্রথম প্রকাশ :

তেরই অগ্রহায়ণ, তেরশ পঁচানব্বই

প্রকাশক :

এ. চক্রবর্তী

আটাত্তর/দুই/এগার, বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট)

কলকাতা-একষট্টি

মুদ্রাকর :

গৌর মান্না

দেবাশিস প্রেস

নয়/সাত বি, প্যারীমোহন সুর লেন

কলকাতা-ছয়

প্রচ্ছদ ও স্কেচ : সুধীর মৈত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

পঁচিশ টাকা

শ্রীস্বদেশ রঞ্জন আচার্য
শ্রীমতী অমিতা আচার্য
যুগলকে

তেরই অগ্রহায়ণ, তেরশ পঁচানব্বই

সূচী

লেখকের প্রকাশিতব্য উপন্যাস

সঙ্গনিঃসঙ্গ

কলমে কার কণ্ঠস্বর

শিউলি মন

পাখিমন

আকাশটা নীল। বেআব্রু সীমাহীন। বর্ণালী বৈচিত্র্যে আনন্দময়। সেখানে সাদা পশমের মত মেঘের ভেলা ভাসে। সোনালি সূর্য ওঠে। টকটকে লাল রক্ত টিপ হয়ে যায়। পড়ন্ত বেলায় বাসন্তী আবীর ছড়ায়। রূপালী চাঁদের থালা থেকে ঝিকমিক দুধ ঝরে। বন্যা বয়ে যায়। সাতরঙা রামধনু তোরণ দেখা যায়। অভ্রকুচির মত লক্ষ কোটি তারায় সাজানো যেন বাহারী বাগান। সেখানে রাতপাখি দিন পাখিরা টলটল জলের মত উচ্ছ্বাস উচ্ছলতায় হাসে ওড়ে। গান গায়, ডিগবাজি খায়। গর্বসুখে নানা অহংকারী আচরণ করে। ভাবে, স্বর্গতো এখানেই।

যৌবনবতী গোলাপরঙা সুন্দরী পাখিটা বড় অহংকারী। নিজেকে সে ডানাযুক্ত পরী মনে করে। কখনও বা স্বর্গের অপ্সরী ভাবতে ভালবাসে। নানা বর্ণের পুরুষ পাখিরা তাকে বৃত্ত করে ঘিরে থাকে। গুণমুগ্ধ তারা প্রণয়প্রার্থী যত। তাদের ঠোঁট থেকে লালসার লালা ঝরে। পাখনার হাত বাড়িয়ে ঈপ্সিত গোলাপী সুন্দরীর শরীর ছুঁতে চায়। সর্বক্ষণ সঙ্গসুখ কামনা করে। মধুর করে সোহাগী নামে ডাকে, 'গুলাবী।' গোলাপী পাখিটা তাতেই আহ্লাদে আটখানা। খুশিতে ডগমগ। আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখে নানা।

হলুদ পাখিটা আকাশছোঁয়া নানা রঙীন স্বপ্ন দেখায়। সীমাহীন আকাশে পাখনা মেলার স্বপ্ন। সাদা পশমের মত মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন। সাতরঙা রামধনু তোরণ দেখাবার স্বপ্ন। বাসন্তী আবীর গায়ে মাখার স্বপ্ন। আরো কত কী যে!

ঝিরঝির বাতাসে গোলাপী পাখিটার নরম পাখনায় দোল লাগে। ফুলের পাপড়ির মত পাখনা পরিষ্কার করে। উন্মুখ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। উন্মনা হয়ে যায়। হলুদ পাখিটার সঙ্গে আকাশে পাড়ি দেবার পরিকল্পনা করে।

সীমাবদ্ধ নীল টলটল জলাশয়ের মাছেরা ভাবনায় পড়ে যায়। গোলাপী পাখিকে মানা করে, 'অবুঝ হয়ো না। উঁচুতে উড়তে গেলে নানা বিপদ আছে।' বনের

গাছেরা বোঝায়, 'কতক্ষণ আর উড়তে পারবে ! ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা তো পাবেই। তখন ফিরতে তো হবে এখানেই।' তৃণ মাটি পাতার ভেতরকার তুচ্ছরা জোট বাঁধে। বলে, 'তোমাকে আমরা ভালবাসি। সে ভালবাসা আকাশের মত অন্তঃহীন। আকাশে কী ভালবাসার চেয়ে মিষ্টিমধুর কিছু পাবে ?'

গোলাপী পাখিটা এসব কথায় গুরুত্ব দেয় না। কারও কোন বাধা মানতে চায় না। পরন্তু যুক্তি দেখায়, 'ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখা কী কোন দোষের ? ছোটরা কী ছোটই থেকে যাবে চিরকাল। বড় জগতের স্বাদ কোন দিনই পাবে না ? ভাল কিছু পেতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হয়।'

তখন শিশির ভেজা ভোরের সোনালি রোদ্দুরে সময়। বাতাসে ছাতিম ফুলের মিষ্টি গন্ধ। গাছেদের চিকন পাতায় শিরশির শব্দ। শুকনো পাতা ফুলের পাপড়ি ঝরছে ঝুর ঝুর। পাকা ধানের ক্ষেতে রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু। তরল রুপোর মত চিকচিক নদী। কুলুকুলু বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝোরা। গুনগুন গাইছে মৌমাছি। রঙীন প্রজাপতি ফড়িং উড়ছে পত্‌পত্‌ ফর্‌ফর্‌। তিড়িং বিড়িং উড়ছে চড়ুই টুনটুনি বুলবুলি মৌটুসি। সজনে ডালে দোল খাচ্ছে নীল পাখি। ঘুঙুর পরা ঝরনায় টু টাং শব্দ। পাশে ছোট্ট জলাশয়ের কাকচক্ষু জলে কুঞ্চিত রেখা। কিছু অংশে শ্যাওলা লতা পাতায় ভরা। ছোট ছোট লাল সাদা বেগুনি ফুল ফুটে আছে। ছোট পোকা-মাকড় ভেসে বেড়াচ্ছে। সবুজ ঘাসের মাঠে চরছে দুধেল গরু-মোষ ছাগল। ঘুরছে ফিরছে বনবেড়াল কাঠবেড়াল বাছুর মুরগী আর তুচ্ছ যত পাহাড় মাটি তৃণ বনবাসী।

গোলাপী পাখিটা যেন কিছুই দেখছিল না। চোখের সামনে শুধু আকাশী স্বপ্ন। সে পলাতকা কিশোরীর মত স্বপ্ন মোহাবিষ্টা।

আদুরে রোদ গায় মেখে হালকা হাওয়ায় পাখনা মেলতে যাচ্ছিল গোলাপী পাখিটা। সঙ্গী হলুদ পাখীটা। খবর পেয়ে ভিড় জমিয়েছে সেইসব গুণমুগ্ধ প্রণয়প্রার্থী পুরুষ পাখিরা। খবর ছড়িয়ে যেতে ছুটে এসেছে শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজনেরা। সকলের মনে উদ্বেগ আশঙ্কা আতঙ্ক। বুকের ছোট্ট ছোট্ট হৃদপিণ্ডে দারুণ দপদপানি।

সজনের ডালে দোল ছেড়ে নীল পাখিটা ছুটে আসে। সমবেত সকলের ভিড় ঠেলে কাছে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

'আকাশে বর্ণালী মেঘের দেশে।'

'বর্ণ গন্ধ রূপ রস তো এখানেই। আকাশে কী ফুল ফোটে, ফল হয় ? -লাশয় পাবে ? অন্ধকারের শয্যায় নিশ্চিন্তে ঘুমোবার ব্যবস্থা আছে ? উড়ে গিয়ে কী

পাবে সেখানে ?'

'তোমরা সব ছোট জগতের। কতটুকু আর খোঁজ রাখ বড় জগতের।'

'জেনে কাজ নেই। এটুকু জানি, আকাশ সূর্য নক্ষত্র ভালবাসার আকর্ষণে এখানেই নামতে চায়। সৃষ্টির জন্য তো স্থিতি চাই। হলুদ পাখিকে নিয়ে বরং এখানেই ঘর বাঁধ দু'জনে।'

'এখানকার সীমাবন্ধ জীবন আমার ভাল্লাগে না। আমি বাঁধনছেঁড়া মুক্ত জীবনকে জানতে চাই। নান্য বৈচিত্র্যের সুধা পান করতে চাই। সীমাহীন অসীমে গিয়ে অজানাকে জানার মধ্যেই তো প্রগতি। তোমরা কেউ আমার গতি রোধ করতে পারবে না।'

'ওই ছোট্ট পাখনা মেলে মেঘের দেশে যাওয়া কখনও সম্ভব হয় ?'

'অসীমের স্বাদ নিতে গেলে ঝুঁকি তো থাকবেই। ছোটবড় কত পাখিই তো যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো না ?'

'তোমাকে বোঝায় কার সাধ্যি। বেশ, তুমিও তাহ'লে ওদের মত অগভীর মনে অপরিণামদর্শী ভেসেই বেড়াও। আমরা কেউ কোন বাধা দেব না।'

নীল পাখিটার পুঁতির মত চোখ বেয়ে তির তির জল গড়ায়। নানা অশুভ আশঙ্কায় বন বাতাস জলাশয় নিথর নিস্পন্দ স্তম্ভিত। ভিড় জমানো সমবেত সকলের চোখে ম্লান বিষণ্ণতার ছায়া নামে। বিচ্ছেদ ব্যথায় বুক ভেঙে যায়। অভিমান ভরে সকলে পথ মুক্ত করে দাঁড়ায়।

গোলাপী পাখিটার চোখে এখন রঙীন স্বপ্ন মোহ কল্পনা। সোনার মত উজ্জ্বল অতীত—স্মৃতি ছিঁড়ে যেতে দুর্বার দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। অপটু অদক্ষ পাখনা মেলে ধরে। অনির্দিষ্ট অসীমের দিকে গা ভাসিয়ে দেয়। পাশে তার ভ্রমণসঙ্গী হলুদ পাখিটা। সেইসঙ্গে বৃত্ত করে উড়ে যায় সেইসব গুণমুগ্ধ প্রণয়প্রার্থী পুরুষ পাখিরা।

সমবেতরা নিচে থেকে সম্মিলিত করুণ চিৎকার করে ওঠে, 'ভুল করছো গোলাপী পাখি। আমরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন। তোমাকে ভালবাসি। ভাল-বাসার বন্ধনছেঁড়া জীবন কখনও সুখ শুভ শান্তির হয় না। এখনো সময় আছে, ফিরে এসো।'

কে কার কথা শোনে! নিচে সকলের দৃষ্টির আড়ালে সদলে উড়ে যায় গোলাপী পাখিটা। দুরন্ত জেদে স্বপ্নমোহে ক্লান্তিহীন উড়তে থাকে। উড়ছে তো উড়ছেই। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। দুপুর গড়িয়ে বিষণ্ণ বিকেল আসে। অথচ, কিছুতেই আকাশ ছুঁতে পারা যায় না। সাদা পশমের মত মেঘের ভেলা দেখা যায় না। সাতরঙা রামধনু তোরণটাও নজরে পড়ে না।

॥ দুই ॥

দিনের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছিল। নদী উপত্যকা বন পাহাড়ে ছায়ার আঁচল বিছিয়ে পড়ছে। তুচ্ছরা তৃণের ভেতর আর পাখিরা নীড়ে ফিরে গেছে। পাহাড় জলাশয় বনবাসী সকলেই যে যার আস্তানায় নিশ্চিন্ত। বাতাসে ভাসছে বুনো পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ।

একটু পরে নিকষ কালো অন্ধকার নেমে আসবে। ঝিঁঝি পোকার ঝিনঝিনানি শুরু হবে। জোনাকি জ্বলবে পিটপিট।

গোলাপী পাখিটা এখনো ফিরল না তো! নীল পাখিটা চিন্তায় পড়ে যায়। আকাশের দিকে উন্মুখ চেয়ে থাকে প্রতীক্ষায়। একসময় ধৈর্য হারায়। সম্ভাব্য বিপদ আশঙ্কায় আকাশের দিকে পাখনা মেলে দেয়।

মায়ের বুকের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজছিল গোলাপী পাখিটা। সে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। পথহারা নিঃসঙ্গ অসহায় একা। নীল পাখির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বিস্ময় আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

'নীল তুমি? কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার সঙ্গে বর্ণালী বৈচিত্র্যের আনন্দ ভোগ করবো বলে এসেছি।'

'পাগল হয়েছো তুমি?'

'কেন?'

'কোথায় বর্ণালী বৈচিত্র্য? তাছাড়া, ভোগের আনন্দ তো ক্ষণিকের। সেখানে ভালবাসা মূল্যহীন। শুধুই প্রবঞ্চনা। শূন্যতার আস্ফালন। পরিণামে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।'

'এসব কী বলছো তুমি? তোমার সঙ্গী সাথীদের তো দেখছি না!'

গোলাপী পাখিটা বুক ভাসিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কোন কথা বলে না।

'তুমি কাঁদছো কেন? এখন তুমি অনেক বড় জগতে এসেছো। স্বপ্নের জগতে কান্না সাজে না। ছিঃ।'

'বড় জগতের সঙ্গীদের মনটা ছোট হয় যে। তারা স্বার্থ নিয়ে সুখের দিনে ভিড় জমায়। বিপদ দেখলেই যে যার পালিয়ে বাঁচে। দেখছো না, এখন আমি কত একা।'

'এরকম হবে আমি জানতাম। তাই তো প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিলাম। তোমার বিপদ আশঙ্কায় ছুটে এলাম।'

'সত্যি!'

গোলাপী পাখিটার চোখ চিকচিক করে ওঠে। থরথর ঠোঁট কাঁপে। ভালবাসার

স্পর্শ পেয়ে বুক ভরে যায়। একটু আগেও সে জানত, রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু অনিবার্য। এখন আশার রোশনাই দেখতে পায়। ভাবে, কাজ নেই সাদা পশমের মত মেঘের ভেলায় ভেসে। সাতরঙা রামধনু তোরণ খুঁজে। সূর্যছড়ানো বাসন্তী আবীর গায়ে মেখে। অভ্রকুচির মত তারায় সাজানো বাগানে ঢুকে। তার চেয়ে বন মাটি পাহাড় জলাশয়ই ভাল।

'তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো নীল?'

'যদি অসীম ছেড়ে সীমায় ফিরতে চাও তবেই তো—'

ভালবাসায় কী না হয়। কৃতজ্ঞতায় গোলাপী পাখির মাথা নুয়ে পড়ে। চোখের তারায় আনন্দ ঝরে পড়ে। পরম প্রাপ্তির পরিপূর্ণতায় উপোসী বুক ভরে যায়।

হঠাৎ জল ঝড়ের একখানা কালো মেঘ ভেসে আসে। কুৎসিত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দৈত্যের মত মেঘটা। তার দাঁতে দাঁত ঘর্ষণের শব্দ হচ্ছে কড়্ কড়ু কড়্ কড়্। আড়াল থেকে আগুন রঙের হিল হিল সাপেরা বেরিয়ে আসছে।

বন পাহাড়ের পাতায় পাতায় অশ্বখুরের শব্দ তুলে বৃষ্টি ধেয়ে আসে। উলঙ্গ ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। এই বুঝি চারদিক ছিন্নভিন্ন ছত্রখান হয়ে যায়। গোলাপী পাখিটার দুরু দুরু বুক কাঁপে। পাখনা-ভেজা নীল পাখিটা অন্ধকারে দিশাহারা বাতাসের তোড়ে পাথরে গাছের ডালে আঘাত পায়। তবু, সে গোলাপী পাখির সঙ্গ ছাড়ে না। দু'জনে বড় বটের নিচে পাতার আড়ালে রাতের আশ্রয় খুঁজে নেয়।

জল ঝড় থেমে যেতে জ্যোৎস্না ওঠে। পিট পিট জোনাকি জ্বলে। ঝিন্ ঝিন্ ঝিঝি ডাকে। ব্যাঙেরা গায় গাঁঙর গ্যাং। গাছেদের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল পড়ে টুপ টুপ। বরফ শীতল বাতাস বয়ে যায় শির্‌শির্। কাঁপন ধরা শরীরে নীল পাখিটা বিরামবিহীন চিঁচিঁ শব্দ করে।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে নীল?'

দরদী কণ্ঠে গোলাপী পাখিটা জিগ্যেস করে।

'কষ্ট ছাড়া কীসের ভালবাসা? অন্যের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিতে পারলে তবেই তো প্রকৃত ভালবাসা।'

অস্ফুট স্বরে নীল পাখিটা জবাব দেয়। একে অপরের ভেজা পালকে ঠোঁট ছোঁয়ায়। উষ্ণতা বিনিময় করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

দুর্যোগের রাত পেরিয়ে সোনালি সকাল আসে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। চিকন পাতায় ফুর্‌ফুর্ বাতাস। পাহাড়ি ঝোরা বয়ে যায় কুলু কুলু। ছোট পাখিরা নাচে তিড়িং বিড়িং। ঝর্ণা ঝরে ঝুরু ঝুরু। প্রজাপতি ফড়িং ওড়ে পত্

পত্ ফর্ ফর্। সব কিছুই যেন যথারীতি গতানুগতিক স্বাভাবিক। সজনে গাছের ডালটা দোল খাচ্ছিল। সেখানে নীল পাখির খোঁজে এসে গোলাপী পাখিটা আঁত্‌কে ওঠে। একী নির্মম নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছে সে! ভেজা সবুজ ঘাসের শয্যায় নীল পাখিটা যেন ঘুমিয়ে আছে। বুকের কাছে আঘাতের গাঢ় ক্ষতচিহ্ন। ক্ষতের চারদিকে বৃত্তাকারে অনেকটা জায়গা লাল কালো নীলাভ। পুঁতির মত চোখের কোণে জমে থাকা শুকনো জলবিন্দু।

গোলাপী পাখিটার অহংকার-মিনার টুকরো টুকরো কাঁচের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। দারুণ দুঃখ বেদনায় ইচ্ছে হয়, সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে ফেলে বিবাগী হয়ে যায়। ভাবে, এইতো কালকেই বড়াই করে বলেছিল সে, 'তোমরা সব ছোট জগতের। কতটুকু আর খোঁজ রাখ বড় জগতের।' তখন কী জানত, নীল পাখিটা খবর রাখত চির আনন্দ মঙ্গলময় সীমাহীন মুক্ত জগতের। আর তার ছোট্ট বুকের গহীনে লুকিয়ে রাখা ছিল মহান ত্যাগের অমরত্ব।

চন্দনা চলে গেলে

প্রথমে গোটা অঞ্চলটাই গ্রাম আর জঙ্গল ছিল। পাশে হুগলী নদী। নদীর ধারে অনেকগুলো ইটখোলা। কিছু চাষ-আবাদের জমি। বাকিটা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। তারপর কোন একসময় চেকসাহেবরা এসেছিল। অনেক দেখে-শুনে নদীর ধারে বিস্তর জমি কিনে চর্মকারখানা চালু করল। সেই থেকে অঞ্চলটার চেহারা পাল্টানো শুরু। চর্মনগরী গড়ে ওঠে। ক্রমে ব্যবসা বাড়লে কারখানা বড় হয়। কর্মীসংখ্যা বেড়ে যায়। অতএব নগর বড় করার জন্য নতুন জমি কেনা হল। নাম রাখল 'গ্রীন ল্যাণ্ড'।

ওপার বাংলার বাঙাল ছেলে আমার পরণে তখন ইজের। 'গ্রীন ল্যাণ্ডে'র পাশের গ্রামে কাকার বাড়ীতে এসে আমি জীবনে প্রথম নগর দেখলাম। তিনদিকে গ্রাম আর একদিকে নদী দিয়ে ঘেরা সুন্দর সাজানো ছোট্ট নগর। 'গ্রীন ল্যাণ্ডে'র বিরাট এলাকা জুড়ে তখন হলব্রিকসের কোয়ার্টারস বসানো চলছে। কিছুটা অঞ্চলে তখনো ধান পাট আখের চাষ হত। অনেক গরু মোষ নিয়ে বড় একটা খাটাল ছিল কোম্পানীর। বড় বড় অনেকগুলো পুকুর ছিল। অজস্র আম তাল নারকেল গাছ। সেসব দেখাশোনার জন্য মাথায় শোলার হ্যাটপরা গুপ্তসাহেব ছিল। গুপ্তসাহেব সাইকেল চড়ে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে বেড়াত।

আমাদের গ্রামে বিজলী ছিল না। 'গ্রীন ল্যাণ্ডে'ও না। সুতরাং, সূর্য ডুবলেই ঝুপ করে সন্ধ্যা। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা পালিয়ে যেত। তারপর যেন অনেক রাত। ঘরে ঘরে হ্যারিকেনের আলো। উঠোনে তুলসীতলায় প্রদীপ। গাছেদের মাথা ছাড়িয়ে বাঁশের ডগায় আকাশদীপ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পুকুরপাড়ে জলাভূমি ঝোপঝাড়ে জোনাকি জ্বলত। জ্যোৎস্নায় হলব্রিকসের কোয়ার্টার্সগুলো দেখতে ছবির মত সুন্দর লাগত।

সে সময় ঘরে ঘরে রিফিউজি। আমরা দু'ভাই—বিনু আর বিধু, মা-র কোলে বোন পুষ্প—এসে উঠেছি কাকার বাড়ীতে। কাকার নিজস্ব সুন্দর বিরাট পাকা বাড়ী। অমন বাড়ী ধারে কাছে আমি কোথাও দেখিনি। মাত্র তিনজনের গাড়ী ছিল। কাকা তাদের মধ্যে একজন।

বাবা তখনও দেশের বাড়ীতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে। আমরা বরাবর থাকব বলে আসিনি। অথচ, থেকেই যেতে হল। কাকা বলল, শাক ভাত খেতে হলেও ভাল। তবু আপনাদেরকে আর ফিরে যেতে দেব না বৌদি। দাদাকেও চলে আসতে চিঠি লিখে দেব।

কাকাকে আমার খুব ভাল মানুষ মনে হয়েছিল। সেই বয়সে ঠিক অতটা তলিয়ে দেখার কথা নয়—কাকা আমাদেরকে এত বেশি করে আঁকড়ে রাখতে চাইছে কেন ?

মা কোম্পানীর কল থেকে খাবার জল আনত। করাতের মত দাঁতঅলা বটিতে খড় কেটে গরুকে জাব দিত। বালতি ভর্তি সিদ্ধ কাপড় কাচত। রান্নাবান্না এবং সংসারের অনেক রকম কাজ করত। কাকার ছেলে দীপুর টম নামে একটা শখের নেড়ি কুকুর ছিল। আমি টমকে স্নান করাতাম। ফ্যান খাওয়াতাম। সব রকম দেখাশুনো করতাম।

কোম্পানীর সঙ্গে কাকার কণ্ট্রাকটরী কাজ। খুব সকালে ভোঁ বাজলে কাকা বেরিয়ে যেত। কা অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে কাকার জন্য চা জলখাবার করে দিত। কাকীমা অনেক বেলায় বিছানা ছাড়ত। চায়ের বদলে এক গ্লাস দুধ খেত। সঙ্গে সিদ্ধ ডিম এবং মাখন মাখানো পাঁউরুটি। দীপু এ-সব তো খেতই সেই সঙ্গে একটা মর্তমান কলাও খেত। আমি আর বিধু জ্বাল দেয়া তোয়াক ভেলিগুড়ে আটার রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে জুল জুল চোখে দেখতাম। পুষ্প দুধ ছাড়া পিউরিটি বার্লি খাবার সময় হাত পা ছুঁড়ে ভীষণ চিৎকার করত। ওকে খাওয়াতে বেশি কষ্ট হলে মা হাঁপিয়ে উঠে গাল দিত, শত্তুর।

দীপু ভাল পোশাক জুতো পরে সাইকেল রিক্শায় বসে স্কুল যেত। আমারও ইচ্ছে হত। মা প্রায়ই বলত, তোর বাবা এলেই তোকে স্কুলে ভর্তি করে দোব। আমি বলতাম, কাকাকে বল না তাড়াতাড়ি চিঠি দিতে। মা কোন জবাব দিত না।

রোজ দুপুরে কাকীমা ঘুমোত। চিৎ হয়ে মুখটা অল্প খুলে ঘুমোলে কেমন যেন মরা মানুষের মত দেখতে লাগত। বিধু আর পুষ্পকে ঘুম পাড়িয়ে মা দাওয়ায় বসে কুলোয় করে চালের কাঁকর বাছত। কাঁথা সেলাই করত। মাঝে মাঝে হাতের কাছে রাখা তালপাতার পাখা নেড়ে ওদেরকে বাতাস করত। মশা মাছি তাড়াত। আমার ভীষণ একা একা লাগত। আমি সারা দুপুর হিজল বন পদ্ম দীঘি ধানক্ষেত আম বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। সেই সময়টা আমার জন্য কোন শাসন ছিল না।

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে ধানক্ষেত। পাশ দিয়ে বজবজ থেকে কলকাতার

দিকে রেল লাইন চলে গেছে। ট্রেন আসার শব্দ শুনলেই আমরা হিজল বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে রেল লাইনের ধারে বাবলা গাছের নিচে দাঁড়াতাম। আমরা অর্থাৎ—মোহন বেণু বলাই এবং অনেক বেশি বয়সের কান্তদা। কান্তদা রেল ইঞ্জিনের কয়লা আরো কী সব নিয়ে ব্যবসা করত ঠিক বুঝতাম না। লাইনের ধারে আগাছা এবং আকন্দ গাছের ঝোপের ভিতর চলন্ত ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভার কয়লার বড় বড় চাক ফেলে যেত। কান্তদা সেগুলো কুড়িয়ে আনত। তারপর বাড়ীর উঠোনে চিতার মত সাজিয়ে পোড়াত।

শীতের দিনে আমাদের কোন গরম জামা-কাপড় ছিল না। আমি বিছানার চাদর গায়ে জড়াতাম। মা একখানা শাড়ী ভাঁজ করে বিধুর গায়ে জড়িয়ে কাঁধের কাছে গিঁট বেঁধে দিত। তারপর দু' ভাই মিলে কান্তদা-র কয়লার আগুন পোহাতে যেতাম। মোহন নিম ডালের দাঁতন নিয়ে আসত। আমাদের দুজনকেও দিত।

কান্তদা একদিন ইঞ্জিন থেকে ফেলে যাওয়া কয়লা জড়ো করতে করতে আমার ভীতু চোখ দু'টোর দিকে বিড়ির ধোঁয়া ছুঁড়ে বলল, কাউকে বলিবনে কিন্তু। তখন বুঝেছি ব্যাপারটা খারাপ কিছু। খারাপ ব্যাপারে আমার দারুণ ভয়। সেই থেকে ভয়ে আমি আর কোনদিন কয়লা কুড়নো দেখতাম না। চোখ ফিরিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাদে জানলায় এবং পা-দানিতে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম ওরা সব যায় কোথায়? কান্তদা বলল, কলকাতায় কাজে যায়। অনেকে কলেজ পড়তে যায়। সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসে।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ মজার মনে হল। ভাবলাম, ওরা বেশ রোজ রোজ গাড়ী চড়তে পারে।

কলকাতা নামটা দেশে থাকতে অনেক শুনেছি। বিশেষ করে কাকা যখন দেশে যেত কলকাতার গল্প খুব করত। শুনতে শুনতে কলকাতার একটা সুন্দর ছবি মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। দেশ ছেড়ে যখন শেয়ালদা স্টেশনে নামলাম—কে যেন বলেছিল, কইলকাত্তা আইস্যা গ্যালাম। শুনে সে যে কী আনন্দ আমার। তখন অনেক রাত। প্লাটফর্মে শুয়ে থেকে সারারাত আমার চোখে ঘুম আসে নি। শুধু লোকজন ভিড় আলো দেখেছি। ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছি—কলকাতা দেখা হয় নি।

আমার ইচ্ছে হল, একদিন লুকিয়ে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় যাব। কিন্তু একা একা সাহস হল না। ইচ্ছেটা বেণুকে জানালাম। বেণুর বেশ পছন্দ হল। পরে অনেক ভেবে চিন্তে বললাম, কিন্তু টিকিট কেনার পয়সা কোথায় পাব? বেণু একটু ভেবে বলল, ধ্যেৎ তুই সত্যিই একটা বাঙাল। ভ্যাণ্ডার গাড়ীতে

চড়লে কোন টিকিট লাগে না—তাও জানিস না ?

—তুই কী করে জানলি ? আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, এর আগেও গেছিস কোনদিন ?

—যাই নি তবু জানি। বেণু বলল, আমাদের গাঁয়ের অনেকে রোজ সকালে ট্রেনে করে কলকাতায় তরকারি বিক্রী করতে যায়। ভ্যান্ডার গাড়ীতে যায় বলে কোন টিকিট লাগে না।

—তাই কখনো হয় ? আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বেণু বলল, পাঁচুর মা-কে জিগ্যেস করে দেখিস। তোদের বাগানের তরকারি তো পাঁচুর মা বিক্রি করে দেয়।

আমাদের বাগানের তরকারি বিক্রি হয়—কথাটা শুনে আমার কেমন যেন কান্না পেয়ে গেল। সব্জি বাগানে আমি যে অনেক অনেক জল ঢেলেছি—কান্না পাবে না ? আমি আর কোন কথাই বলতে পারলাম না।

বেণু আর আমি লুকিয়ে স্টেশনে গেলাম—ভ্যান্ডার গাড়ীতে চড়ে কলকাতায় যাব। গাঁয়ের মহন্তকাকা বেগুনী রঙের জামা প্যান্ট পরে স্টেশনে জল দেয়। স্টেশনের নাম লেখা চার-কোণা কাঁচের বাকসে কেরোসিনের বাতি জ্বালে। ড্রাইভারকে গোলা দেয়। আমাদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে মহন্তকাকা তাড়া করে বলল, টেরেন আসার সময় হইচে, এ্যাত ভিড়ে তোরা কেনে ? যা ভাগ। দে ছুট। আমরা দৌড়ে পালালাম। স্টেশনের বাইরে এসে তবে দৌড় থামল। দূরে সিগন্যালের দিকে তাকালাম। সামনে টেলিগ্রাফ তারে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছিল। তারের ওপর বসে দুটো টিয়া পাখি ল্যাজ দোলাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন এল। ট্রেনের শব্দে টিয়া দুটো উড়ে পালাল। বেণু হতাশ হয়ে লাইন থেকে একটা খোয়া কুড়িয়ে নিল। চলে যাওয়া ট্রেনের দিকে ছুঁড়ে মারল। তারপর লাল ইটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলল, চন্দনাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবি ?

চন্দনাদের বাড়ীর নামে আমার মন নেচে ওঠে। চন্দনার ঠাকুরমা জুবুথুবু বুড়ি আমাকে খুব ভালবাসে। আদর করে অনেক কিছু খেতে দেয়। বাড়ীতে বকুনি খেলে কিংবা খিদে পেলে অসময়েও আমি চন্দনাদের বাড়ীতে ঠাকুরমার কাছে চলে যাই। ঠাকুরমা প্রায় সময় নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে উবু হয়ে ঠাকুর দেবতার বই পড়ে। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সবকিছু বুঝে নেয়। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে কাকা কাকীমার নামে বিচ্ছিরি গাল দেয়। প্রায়ই বলে, তোর মা-কে এ্যাত করে বল্লুন আলাদা বাসা করে পেইলে যা। বলে, কর্তাকে আগে এসতে দিন। এসলেই তো হবে নি ? হোমিপ্যাথ বলে কতা—

ভরসা কী। আমি বলি, শীতে পুকুরে নাবতেই ভয়। নার্মাল শীত পেইলে যায়।
চন্দনারা কয়েক পুরুষ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। ওদের ঘরে বয়স্কদের কথা বলার ধরন আমাদের মত নয়। তবু ঠাকুরমা-র মুখের কথা শুনতে আমার ভাল লাগত। জলের মত সহজ। কেমন যেন মিষ্টি মাখানো। টপ করে গিলে ফেলা যায়।

চন্দনার মা বেলাকাকী চওড়া লালপাড় শাড়ী পরত। আঁচলে বাঁধা একগোছা চাবি। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল। কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। অনেক অনেক পান খেত। টকটকে লাল ঠোঁট। দেখতে প্রতিমা প্রতিমা লাগত। আমাকে দেখলেই বেলাকাকী ভেতর ঘর থেকে চন্দনাকে ডেকে দিত। চন্দনা এসে দাঁড়ালে ঠাকুরমা বলত, দু'জনে খেল গে যা।

চন্দনাদের বাড়িটা বেশ পুরনো। পড়ো মন্দিরের মত দেখতে। বাড়ীটার পিছনে ছোট্ট একটা পুকুর। খুব ছোট ছোট ইটে বাঁধানো ঘাটসিঁড়ি। টলটলে জলে লাল সাপলা কলমিলতা ফুল। সিঁড়িতে বাসন মাজার সময় রোদ্দুরে পুঁটি মাছ ঝিলিক দিত।

খিড়কি থেকে ঘাটের পথে দু' মানুষ লম্বা একটা স্বর্ণচাঁপা গাছ। গাছটার নিচে নিকানো উঠোনের মত মাটিতে গাঢ় দাগ কাটা এক্কা-দোক্কা খেলার ঘর। চন্দনার আর কোন ভাই-বোন ছিল না। মেয়ে বন্ধুও কম। ওর সঙ্গে এই মেয়েলি খেলাটা আমি বেশ ভালই খেলতাম। প্রায় সময় আমাদের দুজনকে গাছটার নিচে খেলতে দেখা যেত। গাছটার ডালে একটা দোলনা ঝোলানো ছিল। চন্দনাই বেশি দোল খেত।

চন্দনাদের বিরাট সব্জী বাগান ছিল। ডাঙা জমিতে হাজার রকমের গাছপালা। আম জাম পেয়ারা জামরুল গাছ। গাব তেঁতুল কুল গাছ। কাগজী বাতাবি গন্ধ লেবু গাছ। একটা আমলকি গাছ ছিল। একটা কমলালেবু গাছও ছিল। নারকেল সুপুরি তাল—আরও কত কী যে গাছ। কদম বকুল গন্ধরাজ হাস্নু-হানা ফুল ফুটত। কলা কচু বাঁশের ঝাড় ছিল। পেঁপে বাগান। বাঁশের মাচায় ঝিঙে শিম লাউলতা। কড়াই অড়হর ক্ষেত। এইসব ফুল ফল সব্জির রাজ্যে আমাদের দু'জনের বেশ সময় কেটে যেত।

সাদা লাল ছাপ ফ্রক পরত চন্দনা। বুকের কাছে একটা পকেট। খাটো সোনালী চুল। স্বর্ণচাঁপার মত গায়ের রং। কাজল টানা নীল নীল চোখ। দেখলে মেম মেম মনে হত। মা বলত, বামুনদের ঘর ছাড়া অমন সুন্দর মেয়ে নাকি খুব কম দেখা যায়।

চন্দনা কারও সঙ্গে তেমন মাখামাখি মিশত না। বেশ আদুরে এবং অহংকারী।

আমার কাছে অবশ্য কোন অহংকার করত না। বরং এমন একটা ভাব করত যেন অন্য সকলের চেয়ে আমি আলাদা। অর্থাৎ আমি ওর খুব পছন্দমত। চন্দনা প্রায়ই বলত, বেণু বলাই মোহন—ওরা সব ছোটলোকের ছেলে। ওদের সঙ্গে মিশবি না।
ওরা আমার বন্ধু। আমাকে খুব ভালবাসে। ওদের সম্পর্কে চন্দনার ঘেন্নার কথা শুনতে আমার ভাল লাগত না। একদিন তাই বলেই ফেললাম, ওরা কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমার বন্ধু হতে চায়। তুমি ওদেরকে ফুল দাও না কেন?
—ইচ্ছে। চন্দনা ঘেন্না আর অহংকার মিশিয়ে বলল, বয়েই গেছে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। তোকে রোজ ফুল দেব। অনেক ফুল।
—অনেক ফুল দিয়ে কী হবে আমার?
—ঘরে রেখে দিলে সুন্দর গন্ধ হবে।
চন্দনা একা আমাকেই ফুল দিত—স্বর্ণচাঁপা ফুল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চন্দনা। গাছে উঠে আমি ফুল তুলতাম। দু' হাতে ফ্রকটাকে আঁচলের মত করে চন্দনা ফুলগুলো ধরে নিত। নিচে নেমে এলে কোঁচড় থেকে আমাকে ফুল দিত—অনেক ফুল। প্রথম প্রথম আমাকে সাবধান করে দিত, ওদেরকে দিবি না কিন্তু। দিয়েছিস জানতে পারলে তোর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।
চন্দনা কথা বন্ধ করে দেবে? আমি ভাবতেই পারতাম না। তার চেয়ে বরং কাউকে ফুল না দেয়াই ভাল। আমি যত্নের সঙ্গে খুব সাবধানে লুকিয়ে চন্দনার দেয়া ফুলগুলো ঘরে আনতাম। তারপর শিয়রের কাছে দেয়ালের তাকে রেখে দিতাম। বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ জেগে থাকতাম তাকে রাখা ফুলের মিষ্টি গন্ধে চোখ বুজেও চন্দনাকে দেখতে পেতাম।
চন্দনার বাবা পরিতোষ কাকা সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে স্কুলে পড়াতে যেত। হাতে অনেক মোটা মোটা বই। পালিশ করা চকচকে চুল। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা। গোঁফ দাড়ি নেই। অথচ দেখলে কেমন ভয় লাগত। আমি খুব সাবধানে পরিতোষ কাকার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতাম। একদিন চন্দনার সাজানো পড়ার ঘরে যখন অনেক সুন্দর সুন্দর বই ছবি খেলনা দেখছিলাম পরিতোষ কাকার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে কাছে পেয়ে পরিতোষ কাকা জিগ্যেস করল, চন্দনা তোমার বন্ধু? আমি ভীষণ ভয় পেলাম। মনে হল, এক্ষুনি বকবে। হয়ত হাতের ছড়ি দিয়ে মারবে। আমি অপরাধীর মত মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। পরিতোষ কাকা বকল না। মারল না। ভারী গলায় বলল, চন্দনা তো লেখাপড়া করে। তুমি করো না কেন?

কি বলব আমি ? কোন উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভিতর বারান্দা থেকে ঠাকুরমা সব কথা শুনেছিল। সেখান থেকেই আমার হয়ে জবাব দিল। আমাদের বাড়ীর অনেক কথা বলল। শুনে পরিতোষ কাকা বলল, কাল থেকে তুমিও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে—তোমার মা-কে বলো। পরিতোষ কাকার সঙ্গে আমি আর চন্দনা রোজ স্কুলে যেতাম। চন্দনা বয়সে আমার চেয়ে ছোট। পড়ত এক ক্লাস ওপরে। স্কুলের জন্য পরিতোষ কাকা আমাকে জামা জুতো প্যান্ট কিনে দিয়েছিল। বই খাতাপত্তর সব। বিনা-বেতনে পড়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

স্কুল থেকে পরিতোষ কাকা ফিরত অনেক দেরীতে। ফেরার সময় শুধু চন্দনা আর আমি। তখন চন্দনার কাছে আমি খুব সহজ হতে পারতাম। চন্দনাকে ঘাস-ফড়িং প্রজাপতি ধরে দিতাম। থোক থোক কৃষ্ণচূড়া ফুল দিতাম। চন্দনা খুব খুশি হত। ওকে খুশি দেখলে আমার যে কী আনন্দ হত।

একটা সুন্দর রঙীন ছাতা ছিল চন্দনার। হঠাৎ বৃষ্টি এলে চন্দনা ওর ছোট্ট ছাতার তলায় আমাকে ডেকে নিত। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে দু'জনেই প্রায় ভিজে যেতাম। তখন সেই বৃষ্টিভেজা ওর নরম শরীর থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যেত।

আমার সব কিছুতেই নাকি বাঙাল বাঙাল ভাব। স্কুলে অনেকে আমাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করত। আমি ঠিকমত জবাব দিতে পারতাম না। সে জন্যে একা একা থাকতাম। লজ্জা দুঃখে চোখ ছল ছল করে উঠত। টিফিনের সময় মুখ ভার করে চন্দনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমার ওপর রাগ দেখিয়ে চন্দনা বলত, হাঁদারাম। তোর গায়ে জোর নেই ? ঠাস করে থাপ্পড় দিতে পারিস না। চন্দনা আমার হয়ে অনেক সময় গলা চড়িয়ে ওদেরকে অনেক শক্ত শক্ত কথা শোনাত। মাস্টারমশাইকে বলে বেত-পিটুনি খাওয়াবার ভয় দেখাত।

টিফিনের সময় স্কুলের সামনে অনেক রকম খাবার আসত। চন্দনার হাতে অনেক পয়সা। মোয়া শোনপাপড়ি চিনেবাদাম কিনে খেত। আমাকেও দিত। বাড়ী থেকে আচার আমড়া টককুল নিয়ে আসত। সেগুলো আমাকে দিত না। ছেলেরা নাকি টক খায় না।

সেবার গরমের ছুটিতে চন্দনা পরিতোষ কাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গেল। কলকাতায় ওর পিসির বাড়ী। আমি ভীষণ একা হয়ে গেলাম। বেণু বলাই মোহনের সাথে খেলতে ইচ্ছে হত না। অনেক সময় মনে হত চন্দনা ছাড়া আমার কিছুতেই চলার নয়। চন্দনা থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই। আমাদের এত যে দুঃখ কষ্ট চন্দনার সঙ্গে মিশলে মনেই থাকে না। চন্দনা না

থাকায় ওদের বাড়ীতে আগের মত যেতে ইচ্ছে হত না। খুব কম যেতাম। গেলে আরো বেশি একা একা লাগত। ঘুরে ফিরে ঠাকুরমা-র কাছে চুপটি করে বসে থাকতাম। ঠাকুরমা একবারও চন্দনার কথা বলত না। আমার মন খারাপ কিনা জিগ্যেস করত না। কিন্তু খেতে দিত। সব খেতাম না। খেতে ইচ্ছে করত না। অথচ কেন সব খেলাম না ঠাকুরমা জানতে চাইত না। আমার ইচ্ছে হত ঠাকুরমাকে জিগ্যেস করি, চন্দনা ফিরে আসতে আর কতদিন বাকি ? অথচ জিগ্যেস করতে কেমন যেন লাগত।

সেদিন বিকেল হবার অনেক আগে চন্দনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল, স্কুল খুলতে দু'দিন বাকি—চন্দনা হয়ত ফিরে আসবে। ভাল আলো পাবার জন্য সামনের বারান্দায় বসে ঠাকুরমা সুর করে রামায়ণ পাঠ করছিল। ভক্তের মত পাশে বসে আমি শুনছিলাম। চোখ ছিল স্টেশনমুখী পথে। ট্রেন থেকে নেমে ওই পথেই চন্দনা রিক্শায় আসবে।

অনেক সময় কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। রোজ সন্ধ্যার সময় একটা ট্রেন আসে। সেই ট্রেনটা এল। কিছুক্ষণ বাদে একটা রিক্শাও এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কিন্তু একা পরিতোষ কাকা নেমে এল। চন্দনা আসে নি। চন্দনা নাকি কলকাতায় পিসী বাড়ী থেকে সাহেবী স্কুলে পড়বে। খবরটা শুনে আমার দারুণ কান্না পেল। ওরা তিনজনে মিলে নিজেদের কথাতেই ব্যস্ত। আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিল না।

আমি অনেকক্ষণ বোকার মত বসে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। খিড়কি পেরিয়ে স্বর্ণচাঁপা গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। চন্দনার দোলনাটা ঠিক তেমনিভাবে ঝুলছিল। দোলনায় হাত রাখলাম। তারপর নিচে মাটিতে হাত বুলিয়ে এক্কা দোক্কা খেলার ঘর খুঁজলাম। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্ট হল। চোখের কোণে জল এল। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসলাম। অন্ধকার নেমে এল। মনে হল, মাথার ওপর গাছটা শূন্য করে টুপ টুপ শব্দে সব ক'টি স্বর্ণচাঁপা ঝরে গেল।

বলয় বন্দী

যথারীতি শনিবার দুপুর দু'টোয় আমার সমস্ত মন জুড়ে নবমী নিশির বিষণ্ণতা নেমে এল। দেড়খানা দিনের অফুরন্ত অবসর—জ্বালা বুকে জড়িয়ে আমি ফাইল বাঁধলাম টেবিল গোছালাম এবং গেলাসের বাকি জলটুকু এক চুমুকে খেলাম। টয়লেটে গিয়ে হাতমুখ ধুলাম মুখ মুছলাম এবং চুলের পরিপাটি করলাম। ব্যস্।

একটা শূন্য মন নিয়ে গেটের বাইরে এলাম আমি। আরো বড় রকম শূন্যতায় ডুবে গেলাম। অসীমের শূন্যতা। রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে একটা চারমিনারে আগুন ধরালাম। ধোঁয়া ছাড়লাম; এবং অনির্দিষ্ট পথে উদ্‌ভ্রান্ত পা বাড়ালাম। আমার চলার প্রতি পদক্ষেপে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো পাক খেতে থাকল। কোথায় যাব এই ভরদুপুরে—বাসায়? বাসা অর্থে রাবিশ-ঝরা পাঁজর-জাগা দুটো ঘর। তিনটে তক্তপোষ একটা আলমারী লক্ষ্মীর আসন বইয়ের তাক ইত্যাদি জাতীয় কিছু কিছু জিনিস-পত্তর। কার্নিশে ঝুল, ইঁদুর মরা গন্ধ; এবং কিছু ধোঁয়া আর অন্ধকার।

মফস্বলের কোন এক কারখানায় দাদা চাকরি করেন, সেখানেই থাকতে হয়। সপ্তাহে শনি রবি দু'দিন ছুটি পান। শুক্রবার রাতে এসে সোমবার সকালে চলে যান।

এই নির্বাক দুপুরে দাদা বৌদি এক ঘরে। অন্যঘরের তক্তপোষে দু'বোন সীতা আর অনীতা। দু'জনেরই বিয়ের বয়েস। পাত্রী হিসেবে 'গৃহকর্মে নিপুণা' সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর সেজন্যেই অযত্ন চেহারা। পড়াতে পারলে দু'চারটে ডিগ্রী হয়ত পেত; কিন্তু স্কুলের পর আর এগুনো সম্ভব হয়নি। আমার তক্তপোষ দখল করে মা এখন তাঁর একমাত্র নাতির গায়ে পাখা নাড়ছেন এবং হয়ত পঞ্চদশবার রামায়ণ পড়ছেন।

এদের নিয়ে আমাদের সংসার। সর্বসাকুল্যে সাড়ে তেরশো টাকার বাজেট। শুধু পাইনি পেলাম না পাচ্ছি না দিয়ে ভরা। এতগুলো বঞ্চিত অবহেলিত প্রাণীর ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাবার দফারফা। একরকম বাধ্য হয়েই

বাবা পঞ্চান্নতে জীবন থেকে অবসর নিলেন, আমি তো কোন ছার। আমি তাই রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকি। আবার বলতে গেলে ভোরের আলোর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচা আর কি। শুধু প্রাণ-পণ্য সংগ্রহ ; পেটে অন্ন ধারণ এবং রাতে ঘুমের জন্য ঘরে ফেরা। স্বভাবতই এখন ঘরে ফেরার তাগিদটা একটু কম।

মানুষের মিছিলে আজকের চলায় আমার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। আমি পিছিয়ে যেতে থাকলাম। ক্রমশই আরো পিছনে পড়ে যাচ্ছি। অনেকদূরে মিলিয়ে যাচ্ছি। অনেকটা স্তিমিত প্রদীপের পোড়া সলতে থেকে আগুনের বিন্দু মিলিয়ে যাবার মত।

একরাশ অলস অবসরের দুশ্চিন্তা আমাকে বিব্রত করতে থাকে। কুলীন চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে নিতান্ত অচ্ছুতের মত হাঁটতে থাকি। রঙ-বেরঙের প্রচ্ছদঅলা বই-এর স্টলগুলোতে সাময়িক দাঁড়াই। সমঝদার খদ্দেরের ভান করে সেক্স পর্ণোগ্রাফী অবসীন সব ওলটপালট করি। পাতার পর পাতা উল্টাই। ছবি দেখি। দু'চারটে লাইন পড়ে নাম দেখে দাম জিজ্ঞেস করি। আবার নতুন করে আর একটা টেনে নেই। পনেরো মিনিটেই দোকানদারের বুদ্ধির কাছে আমার চালাকিটা বেমালুম ধরা পড়ে গেল। চকিতে আমার হাত থেকে নগ্ন মেয়ের ফটো ভরা কাগজটা কেড়ে নিল। জিগ্যেস করল, নেবেন ? আমি যে নেব না, নেবার খদ্দের না এই সত্য উত্তরটুকু দেয়া সাহসে কুললো না। নিজেকে অপরাধী মনে হল। লজ্জা পেলাম। পরক্ষণেই সঙ্কোচ এড়ালাম।

আবার পথ চলতে থাকি। চলমান জনস্রোতে গা ভাসিয়ে, প্রাণের বেগ ফিরে পেতে সচেষ্ট হই। চলার পথে চোখ চলে যায় দোকানের শো-কেসে ট্রাম বাসের জানলায় হরেক রকম পোস্টার আর বিজ্ঞাপনে। বিশেষ করে তরুণীর আধঢাকা জীবন্ত বুকে, নাভিগর্ভ এবং আরো সব নগ্নপ্রায় গ্রন্থি এবং সন্ধিস্থলে। কিছুটা চাক্ষুষ কিছুটা কল্পনায় অনুমানে। রক্তে দারুণ দোলা লাগে। মনে হয়, নরকের স্বাদই বোধহয় ভাল।

সযত্ন সাজান বিচিত্র সাইজের বোতলগুলোর সামনে থমকে দাঁড়াই ; ইচ্ছে হয়, নরকেই যাব চলে। প্রবেশ পথে বোর্ডে সে জন্যে সাদর আমন্ত্রণও জানান হয়েছে। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্তই, ব্যাস্। চরিত্র খোয়াবার জন্য দু'হাতে টাকা দরকার হয়। আর হাতে টু পাইস থাকলে কেই বা চরিত্রের তোয়াক্কা করে। আমিও হয়ত করতাম না। সটান দোকানটায় ঢুকে যেতাম। দামী মাল টেনে নেশা করতাম। আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করত। জ্ঞানচক্ষু খুলে যেত। বলতাম, আই স্যাল নট পাস্ দিস ওয়ে এগেইন।

অতএব, যত পার এ জন্মেই লুটেপুটে নাও। যদি একান্তই কোন ভয় বা দুর্বলতা থাকে তো শেষ দিকে যখন ভোগে অরুচি আসবে তখন এক আধটু ত্যাগ ট্যাগ করো।

কী করতাম তা নিয়ে ভাবনার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। সাধ্য যখন নেই, তখন সার কথা, সুখভোগের পথ বড় পিচ্ছিল বাপু। বড় প্রতিকূল। ওপথে যেও না।

সেই আতঙ্কেই আমি সাপটে গেলাম। আমার দৌড় বড় জোর সিনেমার দোর। শনি রবিবার সেগুলোও কানায় কানায় ভরা। সীমিত সীমানার নোটিশ আগে-ভাগেই ঝুলে থাকে। হন্নে হয়ে এ-দোর ও-দোর ছোটাই সার। তবু আমি ছুটলাম। কেননা 'এনি এক্সট্রা ?' বিষণ্ণ জিজ্ঞাসাটা মাঝে মধ্যে 'সো কাইণ্ড অব ইউ' উচ্ছলতায় ভরে যায়। আজকে ভরল না। বরং প্রত্যাশায় তৃষ্ণাই বাড়ল। বেলা সাড়ে তিনটায় গড়াল। ব্যর্থতা থেকে নিরাশা এবং সবশেষে একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেখে রাস্তায় নেমে এলাম।

রাস্তায় নেমে আমার গলা ভেজানো দরকার মনে হল। স্টলে অথবা তাঁবুর তলায় সাধারণত আমি চা বা কফি খাই। সস্তা অথচ ভাল চটপট সাপ্লাই। দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিজেকে দারুণ নিঃসঙ্গ মনে হল। একটা ছোট্ট স্বপ্ন দেখলাম, এমন তো হতে পারত আমার সঙ্গে একটি মেয়ে, অফিস ফেরতা দু'জনেই এসেছি। কফি খেলাম। গল্প করলাম এবং খানিকটা বেড়িয়ে যে যার বাড়ী চলে গেলাম। এই সামান্য সান্নিধ্যটুকু বেশ কিছুদিন আমার আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার উত্তাপ জোগাতে পারত।

ভাবতে গিয়ে চোখ দু'টো চলে গেল বাসের দো-তলায় পরিচিত নির্দিষ্ট জানলায়। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে উঠে যেত তাপসী। তারপর বাঁ-দিকের জানলার কাছে—সীটটায় বসত। ওই সীটটাই ওর বেশি রকম পছন্দ ছিল। নীচে স্টপেজে দাঁড়িয়ে আমি ওপরের দিকে চেয়ে থাকতাম। জান্‌লার কাছে ওর ওই মৃদু হাসিমাখা মুখটা আমার কাছে ফ্রেমে আঁটা ফটোর মত মনে হত। তখনো বড়বাজারের গদিতে আজকের এই কেরাণীগিরি সুরু করিনি। দিনে অপরিচিত ও স্বল্পবিক্রীত একটা প্রসাধন দ্রব্যের সেলস্‌ রিপ্রেজেণ্টেটিভ। রাতে কলেজে পড়ি এবং ট্যুইশানি করি। সব সময়েই ছোটাছুটি এবং কর্ম-ব্যস্ততা। আমি বি, কম ফাইনাল দিতে চলেছি, তাপসী তখন বেথুনে ফার্স্ট ইয়ার। বালীগঞ্জ থেকে আজাদ হিন্দ বাগ যাবার পথে কখনো সখনো আকাঙ্ক্ষিত দু'জোড়া চোখের সঙ্গম হত। তাপসী মিষ্টি হাসত, আমি যেন ক্লান্ত শরীরে বৃষ্টির পরশ পেতাম। পরক্ষণেই কক্ষপথের আবর্তনে দু'জনেই সরে যেতাম।

তাপসী কে ? সে আমার ভালবাসার প্রিয়জন। এককালে আমার সমস্ত শক্তির উৎস। অনেক সম্ভাবনার প্রেরণা। অনেক স্বপ্ন আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। সে অনেক কথা। ভাবতে গিয়ে বুকটা স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। বাতাসটা ভারী হয়ে আসে। আমি দুর্বলতা অনুভব করি।

একটা প্রচণ্ড রকম দীর্ঘশ্বাস বুকটা শূন্য করে বেরিয়ে গেল। কাপের বাকি কফিটুকু জুড়িয়ে গেল বোধ হয়। শেষ চুমুকে ফুরিয়েও গেল।

সময় যেন আর ফুরোতে চায় না। ঘড়ির কাঁটা নড়ে কি নড়ে না। মনে হয় জমে গেছে। প্রতিটি দিন অবশ্য এমন নয়। সোম থেকে শুক্র বেশ এক সুরে বাঁধা। এ ক'দিন আমার ফেরার একটা তাগিদ থাকে। ছুটির শেষে পাখিদের মত জীবনের গতিতত্ত্ব বজায় রাখি। ছুটন্ত মানুষের মিছিলে পা মেলাই। পিছনে পড়ে থাকে ময়দানের সবুজ ঘাস গাছপালা আর পড়ন্ত রোদমাখা চৌরঙ্গী ধর্মতলা। নয়তো বর্ণালী আলোর মেলা। সে সব ঋতু বুঝে।

এককালে প্রায়ই আমার মনে হতো, অনেক বড় একটা জগত থেকে আমি যেন ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছি—অনেক পিছনে। টুইশানি বাড়ির চারদেয়ালের সীমায় বসে আমি হারিয়ে যেতাম। অসীমের চিন্তায় স্নান সারতাম। সীমা এবং অ-সীমা ক্রমেই হারিয়ে গেল।

একটা কেন্দ্রবিন্দুতে আমি যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি তা বুঝতে পারতাম যখন কোন বন্ধুর ফোন আসত। ওপারের কন্ঠ ডাকত, অফিস ফেরত চলে আয় কফি হাউসে নয়তো হাজরার রেস্তোরাঁয়। আমি অক্ষমতা জানাতাম। অথচ আমার ভিতরকার ইচ্ছেটা পালতোলা নৌকোর মত নেচে উঠত। প্রতি-দিনের একঘেঁয়েমির বাইরে একটু মুক্তির স্বাদ চাইত। আমি কাজের অনুশাসনে তাকে নিবৃত্ত করতাম।

এখনো করি। কর্ম ও কর্তব্যে দায় ও দায়িত্বে গাঁথা জীবনটা যে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। সাহিত্য রাজনীতি-র অসীম নিয়ে চিন্তার অবসর কোথায়। ঘর সামলাতেই বেসামাল। টাকা আরো টাকা। শুধু দু'পয়সা বেশি রোজগারের নিত্য নতুন ধান্দা খুঁজি। আর তাতেই যত ক্ষোভের জন্ম হয়। এক এক সময় মনে হয়, আমাদের মৃত্যু যেন জন্মের পর থেকেই চলছে। প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে। মৃত্যু নিয়েই যেন সংসারে জন্ম হয়েছে। অবস্থাটা অনেকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত।

শুধু সংসার আর সংসার। যত চিন্তা ভাবনা লড়াই সব এই সংসারকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। ছিটকে বাইরে আসার উপায় নেই। বন্ধুদের সকৌতুক বিস্ময়—জিজ্ঞাসা, বিয়ে করিসনি কিসের আবার সংসার ? ওদের

অভিধানে সংসারের অর্থ, স্বামী স্ত্রী সন্তান। ওরা তাই স্ত্রী সন্তান পেয়েছে, আমি পাইনি। এই তেত্রিশের কোঠায় এসেও না। সেজন্যে দুঃখ নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু কারও ওপর ক্ষোভ নেই। নৈরাশ্য আছে কিন্তু মৃত্যু চাই না। বরং বাঁচার নেশাটাই যেন বেশী। যাবার দিন বাবা ওই মন্ত্রটাই আমার কানের কাছে তুলে ধরেছিলেন, 'বেঁচে থাক বাবা, সংগ্রামী হও। দেখছো না কী ভাবে সমস্ত জীবনটা আমি লড়াই করে গেলাম।'

বলতে গেলে সেদিন থেকেই মিছিলে আমার আকাশছোঁয়া বজ্রমুষ্ঠি তোলা সভায় উত্তপ্ত ভাষণ আর যা কিছু জনসংগ্রামের শেষ। এই মুহূর্তে আমার কলেজ জীবনের সেসব কথা ভাবতে ভাল লাগছে। আমার হাতে ফেস্টুন, দৃঢ় পদক্ষেপ এবং অনড় মুষ্ঠি। শ্লোগানের পর শ্লোগান। সতীর্থদের প্রতিধ্বনিতে ক্রমশই মাদকতা অনুভব করছি, ঘামছি। উত্তপ্ত আবেগে একটা কথার ওপর বার বার জোর দিচ্ছি এবং দাঁতে দাঁত চেপে বলে চলেছি, 'অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোস নয়।' অথচ কী আশ্চর্য, আজকে আপোস করেই তো চাকরি বজায় রেখেছি। বেঁচে আছি।

আমি জানতাম, বাবার জীবনই তাঁর আদর্শ। শুনেছি, ঠাকুর্দার মৃত্যুর সময় বাবা তাঁর গোটা আষ্টেক ভাইবোনের দায়িত্ব নিয়ে ঠাকুর্দাকে অভয় দিয়েছিলেন। ঠাকুর্দার প্রাণটা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবে ট্রাডিশান বজায় রেখে আমি সেদিন লক্ আউটে বেকার দাদা সহ মোট পাঁচটি প্রাণীর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। বাবাকে অভয় দিয়েছিলাম। অনুচ্চারিত শপথ পাঠ করেছিলাম। আর সেই মেয়েটা তাপসী যাকে আমি সত্যিকার ভালবেসেছি সে তপস্যায় হেরে যেতে বাধ্য হল। ওকে সেদিন বড় বোঝা মনে হয়েছিল। শুধু ওর ভারটুকু আমি নিতে পারলাম না। সে আমার পরাজয়।

ধুত্তুরি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবনার কোন অর্থ নেই। তার চেয়ে শহীদ মিনারের নীচে মেঠো ম্যাজিক দেখা ঢের ভাল। নয়তো ধর্মতলার ফুটপাত জুড়ে বারমাসী মেলা। দেশী-বিদেশী হরেক রকম জিনিসের পসরা। যতক্ষণ খুশি নেড়ে চেড়ে দেখা চলে। বায়নাকুলারে রাস্তার ঈপ্সিত মেয়েটাকে অনেক কাছে আনতে পারি। সুযোগ বুঝে চাবির রিং-এর গুপ্ত চাকটিতে নিদেন পক্ষে গোটাদশেক উলঙ্গ মেয়ের ফটো দেখা যায়।

শীতের সময়টা আরো ভাল। স্পোর্টস্ কিংবা ক্রিকেট খেলা দেখে দিব্যি সময় কাটে। মাঝে মাঝে অখ্যাত ওষুধের সগর্ব সুখ্যাতি শুনলেও খানিকটা সময় খরচ চলে। 'বিরাট জনসভা' রোজকার খোরাকের মত জীবন জড়িত। ওটি নিত্য থাকবেই। আজকেও আছে। কেন জানিনা কোন কিছুতেই যেন আজকে মন

টানছে না। ভিতরটা ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠছে। পায়ে পায়ে ইডেনে গেলাম। ভিতরে ঢুকে একটু নির্জনতা খুঁজলাম। লেকের জল ঘেঁষে করবী গাছটার নীচে সবুজ ঘাসের ওপর বসলাম। সামনে লেকের জল, গুটিকয়েক কাক শালিখ প্রজাপতি ফুল পাতা ইত্যাদি মিলে বেশ ভাল লাগল।

কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ-এর ওপরের ঘড়িটায় পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। আমি ফিরবার কথা চিন্তা করলাম। নিত্যকার রডঝোলা জীবন থেকে মাঝে মাঝে রেহাই পেতে আমার ভাল লাগে। পায়ে পায়ে ধর্মতলা থেকে কসবা এমন কিছু দূর নয়। ফিরতি পথে হামেশাই আমি রাসবিহারী পর্যন্ত হেঁটে যাই। ওখান থেকে বাস বা ট্রাম যখন যেমন মেলে। আজকেও তেমনি একটা সিদ্ধান্তে পা বাড়ালাম।

প্রাক-সন্ধ্যা থেকে কলকাতা যেন শৌখীন তরুণী হয়ে সাজতে থাকে। চৌরঙ্গী পাড়ার যৌবনটা যেন উপচে পড়া পানীয়ের মত। ফুটপাত রাস্তা ময়দান জুড়ে শুধু ভীড় আর ভীড়। রঙ বেরঙের শাড়িগুলো অবাধ্য ইতস্তত খসে পড়ে। আদল গায়ের চকমকি জ্বলে। পরিচ্ছন্ন নাভির নীচে বেশ খানিকটা বেআব্রু থাকে। কোমরে ভাঁজ খেলানো হাঁটা। রুজ লিপস্টিক আর ড্রেসড্ হেয়ারে ফুটপাত জোড়া। বাস-স্ট্যাণ্ডে ল্যাম্প পোস্টের নীচে রাস্তার মোড়ে কিংবা বিশেষ কোন নির্জনতায় বেশ্যাদের হা-পিত্যেস। ট্যাক্সি পার্ক আর ময়দানের নির্জন আলোয় কালোর ঘনিষ্ঠ-হৃদয় জোড়া। এক-আধটু চুমুটুমু ইত্যাদি। কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি।

আমার চোখ দুটো টনটন করে ওঠে। মনটা আনচান করে। ত্রস্ত পা চালিয়ে মনকে বলি, যত পার এসব এড়িয়ে যাও। তবু কী সব সময় মনকে বেঁধে রাখা চলে? তেত্রিশের কোঠায় এসে সে এক্তিয়ার মানতে চায় না। মাঝে মাঝে বিদ্রোহের হুমকি দেয়। বয়সকে দাবিয়ে রাখতে চায়। এ তাদের চিরকালের দ্বন্দ্ব।

ক্যাথেড্রাল চার্চ রবীন্দ্রসদন তথ্যকেন্দ্র অঞ্চলটা বেশ আলো-আঁধারি। কোন উচ্ছলতা নেই। শান্ত নিস্তব্ধ। এ পথটা আমার বেশ পছন্দ। একটু বাঁক নিয়ে এই পথে পা চালালাম। একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সামনের দুটো গাছে গুচ্ছের খানিক লাল নীল আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অসহ্য লাগল।

আলোর ওপর বিদ্বেষ আমার অনেককাল থেকে। বর্ণবৈষম্য থেকে তার জন্ম। পথ চলতে মনে হল যত সৌন্দর্য সে তো অন্ধকারে। কেন জানি না অন্ধকারের ওপর আমার একটু দুর্বলতা আছে। সে আমাকে অত্যন্ত নিবিড় করে কাছে টানে। আর তখনি মানুষের ভীড় আমার কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

ফিরতি পথে এইসব পরিচিত দৃশ্য দেখে দেখে যখন বৈচিত্র্যকে ভুলতে বসি তখন মানসচিত্র আঁকতে অনুভূতিতে প্রাণস্পন্দন পাই। এই স্পন্দনই হয়ত বেঁচে থাকার লক্ষণ। সেজন্যেই আজো এই তেত্রিশের অবুঝ মনটা মাঝে মাঝে সবুজ হয়ে ওঠে।

বাকি পথ চলতে কেমন যেন আমমনা হয়ে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা অবসাদ বোধ করছি। নতুন করে পা ফেলার শক্তি পাচ্ছি না। ভিতরটা ক্রমশই যেন দুর্বল হয়ে আসছে। অতীত নিয়ে ভাবতে গিয়ে একাধিক দিন এমন অস্থিরতা দেখা গেছে। কিন্তু আজ যেন বেশিরকম দুর্বলতা অনুভব করছি।

যথেষ্ট পরিশ্রম করে রাসবিহারীর বিশেষ বাসস্টপেজটিতে এসে দাঁড়ালাম। সেলটারের রেলিং-এ হেলান দিয়ে একটা চারমিনার ধরালাম। সন্তৃপ্ত ধোঁয়া ছাড়লাম। মুহূর্তে আমার অনড় স্মৃতিটা নড়াচড়া দিয়ে উঠল।

এই স্টপেজটাতে দাঁড়িয়ে না-পাওয়ার ফারাকে খানিকটা মনের খোরাক মেলে। যেন জীবনের এবং-ইত্যাদিভরা দিনপঞ্জীর বাইরে অবকাশ যাপনের মুক্তির স্বাদের মত। পথ চলতে কিংবা এখানে দাঁড়িয়েই অনেক সময় এককালের একান্ত বন্ধুদের সাথে দেখা হয়ে যায়। পথেতেই মানুষের ভীড়ে ওরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কাজের তাগিদে যে যার নির্দিষ্ট নিশানায় ছুটে চলেছে। ঠিক যেন কোলিয়ারীর সেই ঝুলন্ত বাকেটগুলোর মত। দু'দণ্ড দাঁড়াবার অবসর নেই। ওদের কারও হাতে বাজারের থলে কেউবা হাসপাতাল-ফেরতা ওষুধ হাতে। নয়তো বউ নিয়ে বেরিয়েছে সিনেমা দেখতে।

এসব ওদের বন্ধন। আর আমি মুক্ত বলয়ে বন্দী হয়ে ঘুরছি তো ঘুরছিই। এ বলয় থেকে বেরিয়ে এসে কিছু করার উপায় নেই। ইচ্ছে থাকলেও না। পাকে-চক্রে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে, 'কী কেমন আছিস—কোথায় পোস্টিং—ফোন করিস, আসিস একদিন।'—বলার চেয়ে চলার গতি ঢের বেশি। 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলে তাকিয়ে দেখি ওরা সব যে যার লক্ষ্যে ও নিশানায় ছুটে চলেছে। ওদের ঠিকানা কিংবা ফোন নম্বর আমার অজানা। ভাবতে গিয়ে রীতিমত কৌতুককর সাক্ষাৎকার মনে হয়।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, এইসব বিবাহোত্তর বন্ধুদের চলন্ত মুখগুলো আমার সান্ত্বনা না কি অবমাননা। এই বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে তার হদিস খুঁজতে গিয়ে আরো বেশি রকম আনমনা হয়ে যাচ্ছি। পা দুটো ক্রমশই ভারী হয়ে যাচ্ছে। স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে আসছে। ক্রমশই স্তূপীকৃত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। অনেক গভীরে।

একঘণ্টা হয় তাপসীর জন্য দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিটি দোতলা বাসের নম্বরে

তাকাচ্ছি।

বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় খেল না। তাপসী এল। সেই বিশেষ জান্‌লার ফ্রেম থেকে ওর মুখটা পূর্ণাঙ্গ একটা শরীর হয়ে নেমে এল। আমি গম্ভীর হলাম। ও জিগ্যেস করল, কখন এসেছো ? লাইব্রেরী থেকে বই পাল্টাতে একটু দেরী হয়ে গেল—রাগ ক'রনি তো ? ব্যস্‌ আমার সব রাগ জল হয়ে ঝরে গেল।

এরপর আমরা দু'জনে নির্জনে হারিয়ে গেলাম। অবিরাম নিষ্প্রয়োজনের কথা বললাম। চার আনার বাদামে বেহিসেবী সময় কাটালাম। নয়তো বাসে বসে কলকাতার এপার ওপার ঘুরে বেড়ালাম। সে এক গতি তত্ত্ব।

মনে হচ্ছে, সে যেন কতকাল হল। এই মুহূর্তে সে সময়সীমার হিসেব মিলছে না। শুনেছি তাপসীর বিয়ে হয়েছে। কোথায় কার সাথে সে খবর আজো অজানা। বন্ধু মুখে সংবাদটা শোনা। সেই থেকে নিঃসঙ্গতার একটা গূঢ় কান্না অন্ধকারের মত আমাকে ছেয়ে আছে। আমি জীবন চলায় কোন ছন্দ খুঁজে পাচ্ছি না। চাল চলনে গতি মন্থর। উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা লুপ্ত। সৃষ্টির জন্য বিন্দুমাত্র উন্মাদনা নেই। কাজকর্মে নিদারুণ উৎসাহের অভাব। মনের ভিতর শূন্যতার হাহাকার। ভিতরটা ধিকিধিকি জ্বলেপুড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অথচ আমি চলছি ছুটছি এবং নিয়মিত কাজ করছি। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমতালে ছুটছি। কর্তব্য দায়-দায়িত্বে রুটিনমাফিক ট্যুইশানি-বাস-ট্রাম অফিস-ফাইল। আবার ট্রাম-বাস-ট্যুইশানি-বাসা।

এই নিত্যকার চলতি পথে ট্রামে বাসে অনেকের সঙ্গে রোজকার দেখা। সেই থেকে বড় জোর কিছুটা চেনাশোনা। সকলেই আপন গাম্ভীর্যে কেন্দ্রীভূত। ফলত সত্যিকার জানা কাউকেই হয় না। তারা সব চিরটাকাল পর্দার ছবির মত ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। তারপর বিশেষ কোন শুভ দিনক্ষণে সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু নিয়ে হারিয়েও যায়। আমি আঘাত পাই। নৈরাশ্যে ডুবে যাই। ক্লান্ত মন উন্মনা হয়।

এসব ভাবনার কোন অর্থ নেই জানি, তবু ভাবছি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর একটা দু' নম্বর বাস এল। স্মৃতিবিলাসে ছেদ টেনে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বাসে ওঠার প্রস্তুতি নিলাম। হঠাৎ ওপরের নির্দিষ্ট জান্‌লায় চোখ চলে গেল। বুকের ভিতর দারুণ স্পন্দন হল। জানলার ধারে বসা মেয়েটির সঙ্গে তাপসীর মুখের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ালাম। সেই অবসরে বাসটা চলে গেল। অনেক চেষ্টাতেও তাপসীর মুখটা চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল না। মনে হল ওই জানলা থেকে যে একান্ত চেনা মুখটা হারিয়ে গেছে তাকে আর খুঁজে পাবার নয়। সে যেন ক্রমশই বিবর্ণ হয়ে অচেনার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কষ্টকুটুম

পাহাড়ে গা ঘেঁষা সর্পিল পথে সতর্ক মন্দগতিতে প্রাইভেট কারটা ছুটছিল। দু'ধারে শাল পিয়াল ঝাউ—অরণ্য। ডানদিকে খাড়াই পাহাড়। বাঁ-এ গভীর খাদ। আঁকাবাঁকা বিপদসঙ্কুল চড়াই উতরাই। পথে একটা বিকল ল্যান্ড-রোভার দেখে তিতান গাড়ি থামায়। গাড়িটা থামতে দেখে একজন তরুণ বাঙালী যুবক এগিয়ে আসে। তিতান পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করে, সাহায্য করতে পারি? যুবকটির চোখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বালিকা বধূটিকে দেখিয়ে বলে, সঙ্গে আমার স্ত্রী আছে।
—বেশতো। তিতান বলে, দার্জিলিং তো? চটপট চলে আসুন।
তিতানের হাতে ষ্টিয়ারিং। পাশের সীটে বন্ধু সোমেন। পিছনের সীটে ওরা দু'জনে বসল। গাড়ি চলতে থাকে। হঠাৎ জল-ঝড় আসে। প্রচন্ড জল-ঝড়। পর্বতময় বনে বনান্তরে ভয়ঙ্কর তান্ডব শুরু হয়। চারদিক জুড়ে দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঢালপথে জলের স্রোত বয়ে চলে। বৃষ্টিচ্ছটায় পথের নিশানা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসে। গাড়ির হেড-লাইট জ্বেলেও স্পষ্ট কিছু নজরে আসে না। ওয়াইপার স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় সামনের উইন্ড-স্ক্রীনে বিন্দু বিন্দু জলকণা আল্পনা আঁকে। অস্পষ্টতা আরো তীব্র করে তোলে।
সামনের ছোট্ট লুকিং গ্লাসে তিতান দেখতে পায়—বালিকা বধূটি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তরুণ স্বামীকে আঁকড়ে ধরে আছে। তরুণটি ফিসফিসিয়ে ভরসা দেয়, ভয় কী—আমিতো আছি। পাশে বসে সোমেন দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলে না। সম্ভবত, সে ভয়ে চুপসে আছে। অথচ, কিছুতেই ধরা দিতে চাইছে না। এক সময় সঙ্কোচ এড়িয়ে বলে ফেলে, থামিয়ে দে তিতান। এভাবে ঝুঁকি নেয়া ঠিক না।
'ঝুঁকি নেয়া ঠিক না' কথাটায় তিতান আলতো করে হাসে। স্পষ্ট বুঝতে পারে, বালিকা বধূর ভয়, ওর স্বামীর অভয় দেয়া এবং অবশেষে সোমেনের গাড়ি থামাতে বলার মধ্যে অদ্ভুত একটা যোগসূত্র আছে। ওরা নিজেদেরকে ভালবাসে —অপরকে ভালবাসে। নিজের এবং অপরের জন্য ঝুঁকিবিহীন বেঁচে থাকা

জীবন চায়। ওদের জীবনে অনেক ভালবাসা!

একটা বাঁকের মুখে কিছুটা নিরাপদ স্থানে তিতান গাড়ি দাঁড় করায়। সোমেন একটা সিগারেট ধরায়। তারপর সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাইটা তিতানের দিকে এগিয়ে দেয়। তিতান হাত বাড়িয়ে পিছনের তরুণটিকে অফার দেয়। সে ছোট্ট ধন্যবাদে সিগারেট খেতে অনীহা প্রকাশ করে। সোমেন অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, আপনি সিগারেট খান না?

—খুব কম।

তিতান কথার মোড় ঘোরায়। বলে, হনিমুনে যাচ্ছেন?

—ওই আর কি।

তিতান বুঝতে পারে, তরুণটি আলাপে যেতে চাইছে না। সে নতুন করে কথা বাড়ায় না। চুপ করে যায়। কিন্তু সোমেন প্রশ্ন করে, নতুন বিয়ে নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ।

—কতদিন?

—এক মাস হয়নি।

এবার সোমেনও স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাবে, বেরসিক। এরকম লোকের সঙ্গে আলাপে মজা নেই। যেচে গাড়িতে তুলে নেয়া বোকামো হয়েছে। তিতান জানলার কাঁচ অল্প করে নামায়। সিগারেটের শেষ অংশটুকু দু'আঙুলের টোকায় দূরে ছুঁড়ে দেয়। জানলার কাঁচ তোলে। তারপর আয়েস করে গা এলিয়ে বসে। চারদিক তোলপাড় করা শব্দময় জল-ঝড় দেখে। দীর্ঘক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। নিশ্চুপ নীরবতা নিয়ে বসে থাকে। তিতান বিপদের মুখোমুখি বসে থাকা চারটি যৌবন হৃদয়ের স্পন্দন অনুভবের চেষ্টা করে। মনে মনে মিলিয়ে দেখে, বিস্তর তারতম্য, আবার কোথায় যেন গভীর মিল।

এক সময় জল-ঝড় স্তিমিত হয়। গাড়ি চলতে থাকে। সমস্ত বিপদ কাটিয়ে দার্জিলিং পৌঁছয় প্রাক-বিকেলে। দার্জিলিং পৌঁছে, ওদের তিনজনের মুখে আনন্দময় হাসি উচ্ছলতা ভেসে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিতান কষ্টবোধ করে। সেই থেকে বুকের মধ্যে কষ্টের কাঁটা বিঁধে থাকে।

তিরিশ-ঊর্ধ্ব বয়সের কষ্টক্লান্ত হয়ে তিতান হঠাৎ দার্জিলিং বেড়াতে এসেছে। রাতে কম্বলের চাদর গায়ে জড়িয়ে সোমেন এবং সে দু'জনে দু'খাটে মুখোমুখি বসে। সোমেন অল্পবিস্তর সুরাসক্ত। এখানে শীতের প্রাবল্যে মাত্রাটা একটু বেড়ে গেছে। তিতানের কলমের আঁচড় কেটে সোমেন একটু আগে তার প্রেয়সীকে হৃদয়গত রোমাণ্টিক একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিটা তিতানকে পড়ে শোনায়। জিগ্যেস করে, কেমন হয়েছে? তিতান সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, ভাল।

সোমেন নতুন কোন প্রশ্ন করে না। মাথার বালিশের নিচে চিঠিটা সযত্নে ভাঁজ করে রাখে; এবং নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। তিতান জেগে থাকে। কিছুতেই ঘুম আসে না। তার ইচ্ছে হয় একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু কাকে? এই ভরা যৌবনে তার জীবনে প্রেয়সী কোথায়? ছিল কিংবা এখনো আছে বলা যেতে পারে। অথচ, তাকে ইচ্ছেমত কাছে পেতে পারে না। সে সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাকে ধরে এনে বন্ধু প্রিয় আত্মীয়জনে দেখানো যায় না। চিঠি যদিবা লেখা যায়—কোনমতেই তার হাতে পেঁছানো সম্ভব নয়। অথচ, এখানে এই নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণ দুঃখ বেদনায় তলিয়ে যেতে যেতে আলো এসে তার মনের সবটুকু জায়গা কেড়ে নিতে চায়।

এখানে আসার আগের দিন তিতান ফোনে খবরটা জানিয়ে আলোকে বলেছিল, কয়েকদিনের জন্যে হিমালয়-যাত্রী হয়ে দূরে যাচ্ছি। ফোনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট শোনা গেছে, দীপা বলছে, মা-মণি কার ফোন? আলো ধমক দিয়ে বলেছে, তুমি চিনবে না। যাও পড়তে বসো গে।

সম্ভবত দীপা পড়তে চলে গিয়েছিল। ওর আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। বড় বাধ্য মেয়েটা। আলো জিগ্যেস করেছিল, ক'দিন থাকবে?

—ঠিক নেই।

—একা একা যেও না। তুমি বড্ড রাফ ড্রাইভ কর। সোমেনকে সঙ্গে নিও।

—আমার জীবনটাতো নিতান্তই একা-র।

আলো কোন জবাব দেয় নি। তিতান পরে প্রসঙ্গ পাল্টে বলেছে, দীপাকে অমন বকছিলে কেন? আমার কষ্ট হয়।

—আর বকবো না। ওযে ভীষণ জ্বালাতন করে। ফোন এলেই জিগ্যেস করবে, কার ফোন মা-মণি?

—ওকে কিন্তু কোনদিন বুঝতে দিও না।

—চেষ্টা তো করছি। বড় ভয় হয়। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। ফিরে এসে ফোন করবে।

—যদি ফিরে না-আসি—এমন বিপদও তো হতে পারে।

—অলক্ষুণে কথায় কেন আমাকে কষ্ট দাও।

আলোর মুখে কষ্টের কথা শুনে তিতানের আনন্দ হয়। 'কষ্ট' কথাটার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শ পায়। সমস্ত শরীরমনে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে।

দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকায় আলো আবার প্রশ্ন জুড়েছিল, চুপ করে আছো কেন—কী ভাবছো?

—ভাবছি, তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। আজকাল আর আমার কোন কষ্টের কথাইতো তোমাকে জানাই না।
—কেন ?
—মিছেমিছি তোমার কষ্ট বাড়িয়ে কী লাভ !
—সেখানেও তো আমার কষ্ট। তোমার কষ্টে আমার কিছুর করার থাকে না। তবু যে তোমার সব কষ্টের কথা একা আমাকেই জানাও—সেখানেই আমার সুখ। কথা দাও—তোমার সব কষ্টের কথা আমাকে জানাবে।
—জানাবো।

তিতান কথা দিয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে ট্রাঙ্ককলে আলোর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়—জানাজানি হবার ভয় আছে। কষ্টের কথা বলতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

সোমেন অঘোরে ঘুমায়। তিতান জেগে থাকে। পর্বত অরণ্য জাগিয়ে বৃষ্টি আসে। তিতান কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শোনে। পাতায় পাতায় পা ফেলে ছুটে আসা শব্দের ঢেউ কাছে আসে। হৃদয় তোলপাড় করে। আবার অশ্বখুরের শব্দ তুলে দূরান্তে মিলিয়ে যায়। মনে হয়, কে যেন বন্ধ দরজায় আঘাতের পর আঘাত করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

আলো বলেছিল, আমিতো নিঃশেষে ধরা দিতেই চাই। তুমি পারছো কই ? কাপুরুষ !

তিতান ভাবে, অথচ আলো জানত—আমি একসময় ভয়ঙ্কর সাহসী ছিলাম। আমার শীর্ণ দীর্ঘ চেহারায় কী দুর্দান্ত সাহস ছিল। রক্তে আগুনের উত্তাপ ছিল। আলোকে নিজের করে পেতে আমি সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আলো ভরসা রাখতে পারেনি। গর্ভে আমার একমাসের অঙ্কুর সন্তান নিয়ে অন্যত্র বিয়ে করেছে। বলতে গেলে, ওর বিয়ের পর থেকে আমি কাপুরুষ হয়ে গেছি। অস্থির অসুস্থ চেতনা উবে গিয়ে মনুষ্যত্ববোধ জেগে উঠতে আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। একান্ত দুর্বল।

ক্লান্ত দুর্বল রুগীর মত বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তিতান একা একা প্রকৃতির দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের ঢালে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঝাউবন। ঝাউবনের নিভৃত নিরালা—বুকে সযত্নে লুকানো অভিজাত শৈলাবাস। শৈলাবাসের দুধারে কাঁচের গোলাকৃতি লাউঞ্জ। সিঁড়ি বেয়ে একধাপ নিচে নামলে ফুলবাগিচা সবুজ লন ঝাউবনের ছায়া ঘেরা শান্ত নিরালা। দূরে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা হোটেল রেস্তোরাঁ আবাস। ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে অনেক নিচে দৃষ্টি ছুটিয়ে দিলে পিচের ঢেউ খেলানো মসৃণ রাস্তা দেখা যায়।

সে রাস্তায় অনেক গাড়ী-ঘোড়া যাতায়াত করে। পাকা রাস্তা সমান্তরালে সরু রেলপথ। কেন্নোর মত এঁকে বেঁকে রেলগাড়ী যায় আসে। ছাদে চড়ে অনেক যাত্রী পাড়ি দেয়। ছোট্ট ইঞ্জিন হাঁপিয়ে হাঁসফাঁস করে। কয়লার ধোঁয়া ওড়ায়। শব্দ ছড়িয়ে পথ পরিষ্কার করে। দুলকি চালে দৃষ্টি সীমানার বাইরে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

তিতান লাউঞ্জের সামনে লতা পরিবেষ্টিত লৌহপ্রাচীরে আলতো করে হাত রাখে। উম্মুখ চোখ চেয়ে দেখে, সবুজ লনে শিশুরা খেলা করে। ট্যুরিস্ট নবদম্পতি ঘনিষ্ঠ পদচারণায় সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপরে ওঠে। আবার অনেক নিচে নিরালায় নেমে যায়। প্রেয়সীর চুলে একটা উজ্জ্বল ক্যামেলিয়া ফুল গুঁজে দেয়। আদর সোহাগ করে। হাতের ক্যামেরায় ঘন ঘন ফটো তোলে। আদর করে। একঝাঁক চপল তরুণী নিজেদের আড়াল করে গোপনে সেসব দেখে। কাঁচের চুড়ির মত শব্দ তুলে হাসে। একে অপরের গায় এলিয়ে পড়ে।

এসব দেখতে দেখতে তিতান অসহায় এবং নিঃসঙ্গ বোধ করে। ম্যাগনোলিয়া গাছে অনেক ফুল ফুটেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফুলেরা দোল খায়। দূরে কনভেণ্ট স্কুলের চত্বরে লাল সাদা, পোশাক পরা ছোট ছেলেমেয়েরা সারিবন্ধ ড্রিল করে। নাচতে নাচতে ফুলের মত বৃন্ত-পাপড়ি ছড়ায়। মোরগের ঝুঁটির মত দোল খায়। নাচে গায়—ক্লাসে ফিরে যায়।

দীপা সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে! কোন স্কুলে? তিতান মনে মনে টুকরো টুকরো ছবি আঁকে। মুছে ফেলে। ছবি আঁকে। মুছে ফেলে। অবশেষে মুঠো মুঠো বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয়।

সোমেন অনেক দেরীতে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কাছে আসে। জিগ্যেস করে, ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবি তিতান?

—কোথায়?

—শহরের বাইরে।

—গেলেই হয়।

দুজনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হয়। পথে সেই নববিবাহিত তরুণ দম্পতির সঙ্গে দেখা। ওরাও ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। ওরা ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসে। খুব সহজে দুই-এ দুই-এ মিলে চার জন হয়ে যায়। প্রথমে নামধাম জানাজানি—পরিচয় বিনিময়। তারপর টুকটাক কথার শব্দ ছড়াছড়ি। হাসি উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা ছড়িয়ে চারজন পাশাপাশি চলতে থাকে। পিচ ঢালা মসৃণ প্রশস্ত পথ। শহর ঘরবাড়ি। কখনো কাঁকর মাটির সরু রাস্তা। গ্রাম্য-

কুঠির চটি এবং গরিবী আস্তানা। চা-বাগান সবজি ক্ষেত এবং চাষ-আবাদের জমি। বনময় পাহাড়িয়া ফুল। শব্দস্রোতা ঝর্ণা। ঝাউ শাল পাইন পিয়ালের সারি। কাঠের সুদৃশ্য কটেজ।
ক্রমশঃ বেলা বাড়ে। চারজন একত্রে দীর্ঘসময় চড়াই উতরাই ঘুরে বেড়ায়। ছোট খাটো সেতু পার হয়। মাঝেমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে মিলে মিশে হৃদয়মন ছুটিয়ে দেয়। উচ্ছ্বসিত হাসির ফোয়ারা ছোটে। টুংটাং কথার জলতরঙ্গ বাজে। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যপটে ক্যামেরায় নিজেদেরকে ধরে রাখে।
ফিরতি পথে বালিকা বধূ নীরা বলে, আজকের দিনটা দারুণ আনন্দে কাটল। ভাগ্যিস আপনাদেরকে সঙ্গে পেয়েছিলাম। একা একা ভীষণ ভয় করছিল। ওঁর স্বামী দিব্যেন্দু বলে, আমরা দু'জনে খুব বোর ফিল করছিলাম। শুধু দু'জনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে কেমন যেন লজ্জা লাগছিল।
সোমেন এবং তিতান কোন জবাব দেয় না। তিতান গম্ভীর হয়ে যায়। সোমেন ঠোঁটের কোণে সৌজন্যমূলক নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়ে তোলে। বাঁকের মুখে দুই দুই ভাগে আলাদা হয়ে যাবার আগে চার ঘোড়ার পা স্তব্ধ হয়ে যায়। নীরা দূরে হোটেল দেখিয়ে বলে, আমরা ওখানে উঠেছি। সাত নম্বর রুম। বিকেলে আসুন না দু'জনে—একসঙ্গে চা খাব সকলে। তিতান নীরব থাকে। সোমেন আগ্রহ দেখিয়ে বলে, যাব। দিব্যেন্দু বলে, অবশ্যই আসবেন—আজকেই, কাল কালিম্পং চলে যাব। সোমেন বলে, আসবো। তিতানের নীরবতা নীরা লক্ষ্য করে। বলে, আপনি কিছু বলছেন না যে—আসবেন তো?
তিতান অপ্রস্তুত হয়। মাথা নেড়ে জবাব দেয়—আসবো।
—তাড়াতাড়ি আসবেন। চা খেয়ে একসঙ্গে বেড়াতে বের হব সকলে।
বাজারের কাছে চারজনেই ঘোড়া ফিরিয়ে দেয়। নীরা আর দিব্যেন্দু—দু'জনে চলে যায়। তিতান সোমেন অনভ্যস্ত ঘোড়ায় চড়ার ক্লান্তি নিয়ে ধীরে হাঁটতে থাকে। তিতান কেমন যেন গম্ভীর বিষণ্ণ আনমনা হয়ে যায়। সোমেন বলে, কী ভাবছিস তিতান?
—কিছু না।
—কষ্ট হচ্ছে?
—কীসের কষ্ট।
—তোর কীসের কষ্ট তা আমি বলে দেব?
তিতান হোঁচট খায়। দাঁড়িয়ে পড়ে। সোমেনের দিকে একপলক তাকিয়ে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু বলে না। নিজেকে সংযত করে। প্যাকেট থেকে

ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝোলায়। সোমেনকে একটা দিয়ে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে, তোর কষ্টটা কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি।

সোমেন বোবা বোকা হয়ে যায়। দু'জনে ধোঁয়া ওড়ায় আর পথ চলতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পর এক সময় সোমেন বলে, তোর কষ্টটা ঠিকঠাক বুঝতে গেলে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। আলোর বিয়ে হল দুঃখ পেলি। আলোর মেয়ে হল আনন্দে আত্মহারা। আলোর স্বামী শান্ত যখন এ্যাকসিডেণ্টে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে—তুই দারুণ উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছিস। শান্ত ভাল হয়ে ফিরে এলো—তুই পরম খুশী। অথচ শান্তকে হিংসা করিস। সুতরাং, কি বুঝবো বলতে পারিস ?

—যদি বলতে পারতাম তাহ'লে আমার অনেক কষ্ট কমে যেত।

—এমন কি থাকতে পারে জানি না—যা আমাকে বলা যায় না। আমার কাছে তোর কোন কিছুই তো গোপন থাকার কথা নয়।

—আছে। গোপন আছে।

—কী ?

—সুখ। বল ফেললে সেই সুখটুকু হারিয়ে যাবে।

তিতানের শিয়রের কাছে ভারী পর্দা ঢাকা শার্সি-জানলা। পর্দা সরালে আকাশচুম্বী পর্বত চূড়া দেখা যায়। শাল ঝাউ পাইন ঢাকা পাহাড়। মিলিটারী ছাউনি মুখী পাকা সড়কে অবিরাম জীপ ছোটে। ঘোড়ায় চড়ে ট্যুরিস্টরা ঘুরে বেড়ায়। তিতান জানলার শার্সি—ফ্রেমে সমুদ্র ফেনার মত ধ্যানস্থ মেঘটুকরো দেখে। আত্মস্থ হয়ে হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য খোঁজে। ভাবে, জীবনটাতো আদপেই তা নয়। চলাতেই আনন্দ। গতিময় জীবন।

হঠাৎ সাদা মেঘ পালতোলা নৌকা হয়ে পাড়ি দেয়। সাতরঙ বর্ণচ্ছটা নিমেষে উধাও হয়। 'ধূপ' উবে গিয়ে 'কোহরা' ছেয়ে যায়। তারপর সুশৃঙ্খল পদাতিক সৈন্যের মত নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

তিতান ঘর ছেড়ে—হোটেলের গাড়িবারান্দায় আসে। দীর্ঘক্ষণ অশান্ত পায়চারী করে। অগুনীত সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়। একসময় ক্লান্তি বোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে, নীরা আর দিব্যেন্দু নিশ্চয়ই এখন কালিম্পং-এ। সোমেন ? নেশা করতে বাইরে গেছে। সোমেনের প্রেয়সী ? সোমেনের ফিরে যাবার দিন গুনছে। আর আমার জন্য ?

দক্ষিণে ছোট কটেজের জানলায় তিতানের দৃষ্টি থমকে যায়। ঝুলন্ত কার্নিশে সেই তিব্বতী তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায়শই এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকে। ইশারায় কাছে ডাকে। কনকচাঁপা তার গায়ের রঙ। রেশমের মত এক-গুচ্ছ ঝুলন্ত চুল। চোখের মণি দু'টো স্বচ্ছ সবুজ ভুটানী কাঁচের মত উজ্জ্বল। সিঁদুর-রঙা গাল। ঠোঁটে ছলকে পড়া রোদ্দুরের মত উচ্ছল হাসি। আরো কত কীযে। তরুণীটিকে কী বলা যায়—পাহাড়িয়া ফুল? কী ফুল—ম্যাগনোলিয়া নাকি ক্যামেলিয়া। এখানকার স্বপ্নিল শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি পরিবেশে তিতানের স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয়। মনে মনে তরুণীটির নাম রাখে, লিয়া।
হঠাৎ পদাতিক সৈন্যের মত সেই যে দুষ্ট 'কোহরা' ধেয়ে এসে দৃষ্টি অস্পষ্ট করে দেয়। নিমেষে ঘর-বাড়ি, গাছ-গাছালি পথ পথচারী দখলবন্দী করে অন্ধকারে চালান করে দেয়। তিতান স্পষ্টত বুঝতে পারে, লিয়া ঘরে ঢুকে গেছে। 'অর্থাৎ' এখন তার সামনে লিয়া নেই। দীপা নেই। আলো নেই। শুধু অন্ধকার ; এবং নির্বাক বিষণ্ণতা।
বৃষ্টি আসে। দূরের গাছ-পাতা এবং কুটিরের টিনের চালে জলতরঙ্গের অর্কেস্ট্রা বাজাতে বাজাতে বৃষ্টি আসে। দিগন্তব্যাপী শুধু বৃষ্টির শব্দ ভাসে। নজর ছুটিয়ে কিছুই ঠিকঠাক দেখা যায় না। বৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এলে আবছা আলো পথের ওপর ঠিকরে পড়ে। তিতান বিস্ময়ে চোখ চেয়ে দেখে, বর্ণময় একটা ছাতার আড়ালে শরীর বাঁচিয়ে লিয়ার মত কে যেন ক্রমশঃই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মুখটা স্পষ্ট নজরে আসে না।

তিতানের মনে হয়, এখানে এসে অবধি কত সৌন্দর্য দেখছি। অনেক ভোরে সূর্যালোকিত কাঞ্চনজঙ্ঘার মুক্তোঝলমল হাসি। লালটুপি পরা ঘর-বাড়ি। সকাল-সন্ধ্যা হিমেল হাওয়ায় নীল নীল পাহাড় জুড়ে কুয়াশার ওড়না। কখনো নির্মল আকাশ বেআব্রু পাহাড় প্রকৃতি এবং ধূপছায়া। তবু চোখের দেখায় মন ভরে না। হৃদয় তৃপ্ত হয় না। যেন নেশাহত সাময়িক অনুভূতিহীন স্নায়ুর মত। বেড়াতে এসে অনেকেই এমনতর একটা আমেজ নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।
রেডিওতে সংবাদ-তরঙ্গ ভেসে আসে, পশ্চিমবঙ্গ অভুতপূর্ব ভয়াবহ বন্যার কবলে। ষোলটি জেলার মধ্যে বারটি জেলা অগাধ জলে···ভাগ্যের হাতে সমর্পিত লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারী....সমগ্র কলকাতা হাঁটু-কোমর বুক জলে দাঁড়িয়ে। বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জল নেই। যানবাহন স্তব্ধ।······অধিকাংশ স্থানেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কেউই জানেনা, দুর্গত মানুষজনেরা কে কোথায় কেমন আছেন·······
তারপর? রেডিও স্তব্ধ। তিতানের অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। জলবন্দী মানুষজনের কষ্টের কথা। অশান্ত উদ্বেগ বুকের ভিতর ঘূর্ণি ঝড় তোলে। তোলপাড় করে। ত্রাণ এবং পরিত্রাণের দ্বন্দ্ব চলে। বিপদে বৈষম্য ভেদাভেদ উবে গিয়ে মানুষ কতটা একাত্ম হয়? মনুষ্যত্বের পরীক্ষার এইতো শ্রেষ্ঠ সময়।

তিতান স্পষ্টত অনুমান করতে পারে, সংসারী শান্ত এখন নিশ্চিত সর্বজীবের সেবায় সংসার ছেড়েছে। সন্ন্যাসী হয়ে ত্রাণকাজে চলে গেছে। অথচ, তিতান ক্রমশ কেমন যেন বনবাসী—সংসারী হয়ে যেতে থাকে। আত্মমগ্ন হয়ে ভাবতে থাকে, সেদিন ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আলো জিগ্যেস করেছিল, হঠাৎ হিমালয় যাত্রা কেন ?

—তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই। তিতান বলেছিল, অনেক দূরে। কাছাকাছি থাকলেই তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ফোনে শুধু কণ্ঠস্বর শুনে শুনে মন ভরে না। বরং, কষ্ট অনেক বেড়ে যায়।

আলো বলেছিল, ফিরে এলে সেই তো আবার কষ্ট।

তিতান কোন জবাব খুঁজে পায়নি। কিন্তু এখন এখানে এই মুহূর্তে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, না আলো, তোমার কথা মিথ্যে। মিথ্যে মিথ্যে। কষ্ট—ফিরে না গেলেও।

গন্ধ বর্ণ ভালবাসা

সময়টা ছিল পড়ন্ত রোদ্দুর গড়িয়ে বিকেল। কলকাতার নাতিদীর্ঘ দূর মফস্বলের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটা শহর। সেখান থেকে অফিসের জরুরী কাজ চুকিয়ে প্রতীক ফিরছিল। বাস স্ট্যাণ্ডে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে পাঁচ বছর আগেকার তুলনায় ঈষৎ স্থূলকায় চেহারায় পৌঁচেছে। তার কপাল এবং সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর। হাতে শুভ্র শংখবালা। সর্বাঙ্গে উগ্রবর্ণ কাপড়ের জৌলুস।

প্রতীক কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে যারপর নাই চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী আশ্চর্য আপনি এখানে? প্রতীক তার চাকরীগত জরুরী কাজের কথা বলল। সে বুক উজাড় করা একরাশ শ্বাস ফেলে বলল, কতকাল পরে দেখা হল। জানেন, সেই শেষ দেখার সেদিন কলেজ স্যোসালে গান শেষ করে বাইরে এসে আপনাকে কত খুঁজেছি। সেদিনের পর আপনি তো আর কলেজেই এলেন না। পরে অবশ্য শুনেছি, আপনি নাকি চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেছেন।

অপ্রত্যাশিত এসব কথা শুনতে শুনতে প্রতীক অভিভূত হয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে সে তার কান দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারল না। ম্লান হেসে অত্যন্ত অপ্রতিভ জবাব দিল, হঠাৎই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম। এতদিন তো আগর-তলায় ছিলাম। সম্প্রতি বদলী হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু আমাকে সেদিন কেন খোঁজ করেছিলেন বললেন না তো।

—এখন আর জেনে কি হবে?

—তবু বলুন। ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

—একটা জিনিস দেব ভেবেছিলাম।

—কী জিনিস?

—এখন বলব না। কাছেই আমাদের বাংলো। যদি আপত্তি না থাকে একবার চলুন। জিনিসটা এখনো আছে। গেলেই দেখতে পাবেন।

বলতে গেলে অনুচ্চারিত সেই জিনিসটা দেখার জন্য প্রতীক সবিশেষ কৌতূহল বোধ করল। হাতে বেহিসেবী সময় ছিল না। তদুপরি এরকমভাবে তার

বাংলোতে যাওয়ায় যথেষ্ট সংকোচও ছিল। তবু আপত্তি জানাতে মনের সায় পেল না। স্বভাবতই নীরব সম্মতি জানাল।

নদীর ধার ঘেঁষে সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর দিয়ে প্রতীক এবং সে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। টুকটাক মামুলী সৌজন্যমূলক কথার বৃত্ত ছেড়ে কেউই বাইরে আসতে পারছিল না। দু'জনের সমস্ত কথাই যেন কেমন জট পাকিয়ে যেতে থাকল। এক সময় কেউই কোন কথা খুঁজে পেল না। একে নিরিবিলি নিস্তব্ধতা, তার ওপর দু'জনের নির্বাক পথ চলা—সবে মিলে আশ্চর্য এক গুমোট বিষণ্ণতার গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকল।

প্রতীকের ভাল লাগছিল। সে মনে-প্রাণে অদ্ভুত এক তৃপ্তির পরিপূর্ণ আমেজ অনুভব করল। তার মন ক্রমশই উন্মন হল। এক সময় সেই উন্মনা মন উড়ন্ত গাঙচিলের ডানায় ভর করল। সে পিছিয়ে যেতে যেতে পাঁচ বছর আগেকার ছাত্রজীবনে চলে গেল।

পাঁচ বছর আগেকার সেই সময়টাতে—সেই যখন সে ছিল পরিমিত লম্বা এবং অস্বাভাবিক রুগ্ন। অযত্ন চুল চেহারা এবং পোশাক। কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগ। মফস্বল স্কুল থেকে পাশকরা সংগ্রামী সংসারের ছেলে সে শহর কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছে। আচার-আচরণে তখনো চূড়ান্ত মফঃস্বলী ধাঁচ।

সেই সময়টাতে প্রেম সম্পর্কে প্রতীকের ধারণা ছিল অন্যরকম। সে ভাবত, ওসবের জন্য আত্মমগ্ন গভীরতা, রূপ গুণ অর্থ যশ অফুরন্ত অবসর অথবা নিতান্ত বেহায়াপনা—এসবের একটা কিছু অন্তত প্রয়োজন হয়। তার স্থির বিশ্বাস ছিল—এর কোনটাই তার মধ্যে নেই। স্বভাবতই সে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকত।

প্রতীক তখনো সেদিনের মেয়েটি যে কিনা আজ বধূ—তার নাম জানত না। এমন কি তার ঠিকানা এবং পারিবারিক পরিচয়ও অজ্ঞাত ছিল। তবু প্রথম দেখাতেই উজ্জ্বল দু'টো চোখ টিকোল নাক টানা টানা ভুরু দীর্ঘ চুলের বেণী-ইত্যাকার সৌন্দর্য সমষ্টি নিয়ে শিউলি ফুলের মত স্নিগ্ধ লাজুকতা মেয়েটিকে তার ভাল লেগেছিল।

মেয়েটি এক ঝাঁক খুশি ঝলমল মেয়েদের মধ্যে মিলেমিশে থাকত। তবু সমস্ত ভীড় ভেদ করে প্রতীকের সন্ধানী তৎপর দৃষ্টি কেবলমাত্র সেই বিশেষ মেয়েটির বিন্দুকে কেন্দ্র করে নিয়ত ঘূরপাক খেত। ক্লাস শেষে ভীড়ের মধ্যে দু'জনে কেমন করে যেন কাছাকাছি হয়ে যেত। মাঝে মধ্যে দৃষ্টিসঙ্গম কালে মেয়েটি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে সাময়িক দৃষ্টি ফেরাত। পরক্ষণেই সমস্ত সঙ্কোচ এড়িয়ে

আবার আবার নিশ্চিত তাকাত। সেইসব মুহূর্তে প্রতীক তার প্রতিটি শিরায় অদ্ভুত রক্ত চাঞ্চল্য অনুভব করত। খুশির পরিতৃপ্ত আমেজে উচ্ছল হয়ে উঠত। বস্তুত তার চোখের চাহনি আর মুখের ভাবান্তর দেখে দেখেই সে জীবনে প্রথম বুঝতে শিখেছিল, চোখেরও ভাষা আছে—চোখ কথা বলে। সে সেই অনুচ্চারিত অব্যক্ত ভাষা পড়তে পড়তে এক সময় লক্ষ্য করেছিল, তার ভিতরকার সবুজপত্র গাছে কবে কখন যেন একটা কুঁড়ি রক্তবর্ণ গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। সেটি কেবলই দোল খায়। উজ্জ্বল বর্ণ বিলাসে সৌরভ ছড়াতে চায়।

প্রতীকের ভাবতে ভাল লাগল, আজ এই প্রাক্‌সন্ধ্যায় সেদিনের সেই ঈপ্সিত মেয়েটির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে সে পাশাপাশি হাঁটছে। কোন সঙ্কোচ দ্বিধা ভয় তাকে গ্রাস করতে পারছে না। অথচ শেষ দেখার সেই সন্ধ্যাটি ছিল অন্যরকম।

কলেজ স্যোসালের সেই প্রার্থিত সন্ধ্যাটির কথা ভেবে প্রতীক আজ অনেক দিন পর আবার বিষণ্ণ বোধ করল। স্পষ্ট মনে পড়ছে, সেদিন কাক ডাকা ভোর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে সে অদ্ভুত এক মানসিকতায় চঞ্চল উচ্ছল খুশি ঝলমল ছিল। দুপুরে অনেক চেষ্টাতেও চোখের পাতা দু'টো এক করে ঘুমোতে পারেনি। তন্দ্রালু চোখ জুড়ে সর্বক্ষণ সেই বিশেষ মেয়েটির মুখটা কেবলই সবুজ ফেনার মত উছলে পড়েছে। সে সারা দুপুর মনের সুখে দু'হাত ভরে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়িয়েছে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর জানলায় তার ফিকে হলুদ আলো ছড়িয়ে যেতে প্রতীক ব্যস্ততায় শয্যা ছেড়ে উঠেছিল। তারপর ধোপ দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরেছে। চুলের পরিপাটি করে পায়ে গলিয়েছে নাগড়াই জুতো। রাস্তায় পা ফেলে অকারণেই সেদিন একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। আর সেই স্বপন সঞ্চারিণী মেয়েটিকে দেবে বলে বুকের ভিতর অনেক গভীরে উজ্জ্বল একটি লাল গোলাপ সযত্নে লুকনো ছিল। সারাক্ষণ সে সেই ফুলের সৌরভে শিহরণ অনুভব করেছে। সমস্ত প্রাণ-মন উত্তপ্ত আবেগে চঞ্চল হয়ে ছুটতে চেয়েছে।

মঞ্চে তখন দুগ্ধ ধবল আলোর বন্যা। উইংসের পাশে আলো-আঁধারে প্রতীক অশান্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেলে কেবলি তাকে খুঁজছিল। মঞ্চে বসে কে যেন তখন গাইছিল, 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না ……।'

সেই মুহূর্তে গানের প্রতি প্রতীকের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। প্রত্যাশায় ব্যাকুল তার চোখ দু'টো অনেক আলো ছড়িয়ে বিরাম বিহীন জ্বলছিল। অথচ কিছুতেই তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। সেজন্য গভীর মানসিক উদ্বেগ বোধ করছিল।

একসময় মৃদু স্নিগ্ধ পবিত্র একটা ফুলের গন্ধে প্রতীকের সমস্ত বুক মন ভরে উঠল। তখন বুকের ভিতরকার সযত্ন লুকনো লাল গোলাপটা অবিরাম দোল খেতে খেতে সারা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, প্রার্থিত সেই স্বপন-চারিণী মেয়েটি কখন যেন চুপিসারে তার কাছে এসে অল্প ব্যবধানে দাঁড়িয়েছে। তার পরনে চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ী। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। রেশমের মত একরাশ কালো চুলের খোঁপায় জড়ানো জুঁইফুলের মালা। পুরুষ্টু কাজল টানা চোখ। হীরকের মত উজ্জ্বল দু'টো মণি। কপালে ছোট্ট একটা চন্দনের টিপ। সারা শরীরের কোথাও কোন অলংকার প্রসাধনের বাহুল্য নেই।

প্রতীক অবাক বিস্ময়ে দেখতে দেখতে পরম প্রশান্তিতে তার চোখের সমুদ্রে নিজের চোখ দু'টোকে শুইয়ে দিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তার ঠোঁটের রক্তিম পাপড়ি দু'টো কিঞ্চিৎ কেঁপে কেঁপে উঠল। সম্ভবত সে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সঙ্কোচ এড়াতে পারল না। হয়ত কিছু শুনবে বলেই উন্মুখ হয়ে প্রত্যাশায় ব্যাকুল চোখ চেয়েছিল।

সেই পরম মুহূর্তে প্রতীক তার আশা-নিরাশায় ফুটে ওঠা লাল গোলাপটা তাকে দিতে চেয়েছিল—পারেনি। বারবার চেষ্টা করেও পারেনি। কেন যেন ভয় হয়েছিল। তাই ব্যর্থতায় ডুবে যেতে যেতে দু'জনকার বিস্তর ব্যবধান অসামঞ্জস্য এবং বিরাট অসম্ভব দিয়ে ঘেরা জীবনের বাস্তব দিকটা ভাববার চেষ্টা করেছে। কবে যেন কোন বন্ধু প্রিয়জনকে একান্তে ডেকে মনের অস্থিরতার কথা জানাতে শুনতে পেয়েছিল, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াস না। সেই বন্ধুর মুখেই শুনেছিল, সে নাকি ধনী বাপের একমাত্র কন্যা। বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায় তিনতলা বাড়ী আর দু'খানা গাড়ী আছে। সেইসঙ্গে এ্যালসেসিয়ান কুকুরও।

শেষের কথাটা এত বেশী বিদ্রূপ মেশানো ছিল যে প্রতীকের সমস্ত শরীর জ্বলে উঠেছিল। সেইসব পুরণো পরোয়ানার স্মৃতিচারণ করতে করতে সে হীনমন্যতায় চুপসে যেতে যেতে নিজেকে শান্ত সংযত করতে তৎপর হল। তবু বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখ চেয়ে তার পাগল করা সৌন্দর্যের দিকে স্তব্ধ তাকিয়ে থাকল।

কিছু শুনবে বলে সে প্রত্যাশায় থেকে থেকে এক সময় মঞ্চে গান গাইতে চলে গেল। আর তখনি প্রতীক তার ব্যর্থতা ভীরুতা আর মানসিক হীনমন্যতায় একরাশ ক্ষোভ নিয়ে অনুষ্ঠান চত্বর ছেড়ে চলে এসেছিল।

সেই শেষ দেখা। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই সময়টা প্রতীক বাংলার বাইরে বৃত্তি আর ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে বড় বেশীরকম ব্যস্ততায় দিন

কাটিয়েছে। ফলত অনেক ভাললাগা মুখটা যখন প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে তখন আচমকা আজ আবার দেখা।

নদীর ধারে গাছপালা লতায় ঘেরা ছোট্ট সুন্দর বাংলো। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে অনেক ফুলের আগুন। বর্ণালী ফুলের বাগান সবুজ লন পেরিয়ে ওরা দু'জনে বাংলোর ভিতর ঢুকলো। সে টুকটাক কথার ফাঁকে তার ঘুমন্ত সন্তান সাজানো ঘরদোর বৈঠকখানা দেখাল। অনুপস্থিত স্বামীর ফটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দু'জনে সোফায় গা এলিয়ে মুখোমুখি বসল। টেবিলের দুইপ্রান্তে দু'টি হৃদয় যখন ব্যবধানে থেকেও একে অপরের পরশ পাচ্ছিল তখন জলখাবার এল। সে যথেষ্ট আন্তরিকতায় অতিথি আপ্যায়ন করতে করতে বলল,—বিয়ে করেছেন ?

—না।

—করবেন না ? দেরী করছেন কেন ?

—মনের মত মেয়ে পাচ্ছি না যে।

—আজ পর্যন্ত একটিও পাননি ?

—পেয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছি।

একমুঠো উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে প্রতীক জবাব দিল। তারপর নিশ্চুপ মুখ নীচু করল। অনেকক্ষণ একগলা বিষণ্ণ নীরবতা দু'জনকে ছেয়ে থাকল। দু'জনে ক্রমশই বেশিরকম গম্ভীর ও আতমগ্ন হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলার ভাষা খুঁজে পেল না। একসময় সেই দুঃসহ স্তূপীকৃত শীতল নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রতীক বলল, আপনি কিন্তু কী সেই জিনিসটা যা সেদিন আমাকে দিতে চেয়েছিলেন তা এখনো দেখালেন না।

অকস্মাৎ তার চোখ দু'টো নিভে গেল। ম্লান হেসে সে তার করতলে রাখা গীতাঞ্জলির পাতা খুলে ধরল। দু'টি পাতার ফাঁকে বিকৃতবর্ণ শুকনো চ্যাপ্টা কী যেন একটা ফুল। সে বলল, পাঁচ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যাতে এই গোলাপটা কিন্তু মিষ্টি গন্ধে ভরা অপূর্ব লাল ছিল।

প্রতীক তাৎক্ষণিক কোন জবাব খুঁজে পেল না। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সে পিছু পিছু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রতীক পিছন ফিরে তাকাবার ভরসা পেল না। সারাটা পথ কেবলই বুকের ভিতর লুকানো পাঁচবছর আগেকার লাল গোলাপটা খুঁজে ফিরল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার বুকের ভিতরকার গোলাপটাও এতদিনে ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেটি আগেকার মত দোল খায় না। চঞ্চল উচ্ছল কিংবা উত্তপ্ত করে তোলে না। তবু অতি গোপনে অনেক গভীরে সৌরভ ছড়িয়ে যায়।

সূর্যবিন্দু

প্রায় বছর পাঁচেক পরে বাণীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সময় পড়ন্ত রোদ্দুর গড়িয়ে বিকেল। শিবাজী ওর অফিস সংক্রান্ত কিছু জরুরী কাজে কলকাতায় এসেছে। দিনান্তের কাজ চুকিয়ে হোটেলে ফিরছিল। পথে বাণীকে দেখতে পেল। বাণী অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ট্রাম স্টপেজে অপেক্ষা করছিল। শিবাজী ভীড় কাটিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই বাণী যারপর নাই চমকে উঠল। অত্যুৎসাহে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, কী আশ্চর্য তুমি ?

—হ্যাঁ, আমি শিবাজী সিংহ সুদূর বোম্বাই থেকে কলকাতায় এখন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

—তুমি তাহ'লে বম্বেতে চাকরি করছো—জানতামই না। পরীক্ষার পর সেই যে ডুব মারলে আর কোন খোঁজ-খবর নেই। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিয়ে কিছুটা অনুযোগের সুরে বাণী জবাব দিল।

একটা ট্রাম এসে স্টপেজে দাঁড়াতে বাণীর সঙ্গিনী মেয়েটি ঝটিতি উঠে পড়ল। যাবার আগে বলে গেল, আমি চললাম ভাই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। বাণী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ট্রামটা চলে যেতে মুখ ফিরিয়ে শিবাজীর বিস্ময়কর চোখ দু'টোর দিকে তাকাল। ওর কৌতূহলে প্রলেপ দিয়ে বলল, আমার অফিসের বন্ধু—শান্তা। নতুন প্রেম চলছে। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। তাই—

শিবাজী যথেষ্ট অনাগ্রহ দেখিয়ে বলল, জানতে চাইনে। তুমি বরং নিজের কথা বল। তোমার স্বামী সন্তান সংসারের কথা।

—আমার সন্তান হয়েছে সে খবরও রেখেছো দেখছি ! কিছুটা তির্যক ঢঙে বলল কথাটা। পরক্ষণেই স্বভাব সুলভ আন্তরিকতায় জিগ্যেস করল, বসবে কোথাও ? হাতে সময় আছে ?

শিবাজী একরকম অকারণেই ডান হাতের কব্জি ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, অফুরন্ত সময়। এখানে সময় কাটতেই চায় না। মাত্র চারদিন হল কলকাতায় এসেছি, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন হল। এখানকার লাইফটা বম্বের

তুলনায় অনেক স্লো।
বাণী স্মিত হেসে বাঁকা দৃষ্টি ফেলে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকের মত বলল, নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতা তোমার চিরকালের বিলাস। চল, একটা ভাল রেস্টুরেন্ট দেখে খানিকক্ষণ বসা যাক।
শিবাজী বলল, এই অঞ্চলটা সম্পর্কে আমি একান্তই অনভিজ্ঞ। ভালমন্দ তোমাকেই বেছে নিতে হবে।
বাণী আবার তির্যক চেয়ে হাসল। বেশ অর্থপূর্ণ হাসি। নিজে থেকেই সামনে পা বাড়িয়ে বলল, চল। ট্রাম লাইন পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা জুড়ল, অঞ্চলটা আমারও তেমন পরিচিত নয়। তবু যেহেতু বম্বে থাকি না তাই কিছুক্ষণ বসার মত ভীড় কম একটা জায়গা জানা আছে।
শিবাজী ইচ্ছে করেই নতুন কোন জবাব দিল না। বাণীর কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল সেটা গায়ে মাখল না। বরং আলতো করে হাসল। বাণীকে অনুসরণ করে একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। ভিতরে ঢুকে বাণী জিগ্যেস করল, কোথায় বসবে—কেবিনে, না বাইরে?
—যা তোমার ইচ্ছে। কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। অল্প বয়সী বেয়ারা ছেলেটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের কথার সূত্র ধরে বলল, কেবিন খালি নেই। একটু দেরী করুন, এক্ষুণি খালি হয়ে যাবে। কথাটা বলেই সে ব্যস্ততার সঙ্গে মৌরী ঢালা ডিসে বিলসহ একটা কেবিনের দরজায় টোকা মারল, এবং শব্দ করে ভিতরে ঢুকলো।
শিবাজী এবং বাণী পরস্পরের চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল এবং নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল।
কিছুক্ষণ বাদেই একদম কোণের কেবিনটা ফাঁকা হয়ে গেল। অল্প বয়সী ছেলেটি টাকার হিসেব মেলাতে মেলাতে কাছে এসে চটপট জানাল, কেবিন খালি। আসুন স্যার।
কেবিনের ভিতরে ঢুকে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল। ছোট্ট কেবিন। দু'টোই সীট। সামনে দেয়ালের গায়ে সুন্দর একটা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না আঁটা। যদিও ভিতরে অস্বচ্ছ আলো, কিন্তু যুগল-প্রতিচ্ছবিটা বেশ উজ্জ্বল লাগছে।
শিবাজী ওর হাতের এ্যাটাচিকেসটা পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল। বাণী ওর কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগটা টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের মালিন্য মুছতে তৎপর হল।
এই নিয়ে অনেকবার হল বাণী শিবাজীর সঙ্গে পর্দাঢাকা কেবিনে ঢুকলো। বাণীর কাঁধের ওপর দিয়ে শিবাজী চেয়ারে হাত রাখল। তারপর নিচুস্বরে বলল,

জানো বাণী—আমরা সকলেই এক একজন ছোটখাটো নাবিক বলা যেতে পারে। আমরা দিশাহারা হয়ে আকাশের ধ্রুবতারা খুঁজি। হাটে-বাজারে, নয়তো খেয়া-ঘাটে। স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ি।
বাণী কথাগুলোর সঠিক অর্থ খুঁজে পেল না। তবু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল। চোখের মণি দু'টো বার কয়েক নাচালো। ভুরু দু'টোতে অপূর্ব ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু কোন জবাব দিল না।
শিবাজী সামনের আয়নায় বাণীর ঠিকরে পড়া হাসির রেশ দেখে দ্বিধাহীন ভাবে মন্তব্য করল, তোমার হাসিটা কিন্তু ঠিক আগেকার মতই সুন্দর আছে।
—আর আমি ? করতলে মুখ পেতে নিষ্পলক চোখ চেয়ে বাণী জানতে চাইল। আপাদমস্তক জরিপ করে শিবাজী জবাব দিল, একটু মুটিয়েছো বটে, তবে তাতে সৌন্দর্যের কোন ক্ষতি হয়নি।
বাণী আত্মতৃপ্তিতে শব্দ তুলে সোচ্চার হাসল। হাসির রেশ স্তিমিত হতে জিগ্যেস করল, বিয়ে করেছো ?
—না।
—কেন ?
—কে বিয়ে করবে আমায়। তাছাড়া, মনের মত মেয়েই বা আর পেলাম কোথায় !
—আমি কিন্তু তোমাকে চেয়েছিলাম। তুমি বারবার আমাকে এড়িয়ে গেছ। অথচ, আমি যে তোমার মনের মত নয়, একথা কখনো বলনি।
কথাটা সত্যি। তাই শিবাজী কোন জবাব খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে আত্মমগ্ন গভীরে ডুব দিল। ফেলে আসা কলেজ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য-জনিত দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। সে এক সময় গেছে—সংসারের প্রতি যখন তার অনেক দায়-দায়িত্বের বোঝা। অনেক ভাবনা চিন্তা। বাবা ক্ষয়রোগে হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুণছেন। মা অর্ধপাগল হয়ে মানসিক হাসপাতালে। দু'টি বিবাহযোগ্যা বোন। সে সকাল বিকেল টুইশানি করে সংসার চালাবার সংগ্রামে ব্যস্ত। প্রেম-ভালবাসা স্বপ্ন আর রোমান্টিকতা তখন শুধু বিলাসিতা নয়, সম্পূর্ণ কল্পনার বাইরে। এখনও মনে পড়ে, এমন দিনও গেছে যেদিন উনুনে জল চাপিয়ে চালের যোগাড়ে যেতে হয়েছে।
বাণী এতকিছু খবর জানে না। শিবাজী ইচ্ছে করেই কোন দিন কাউকে জানিয়ে করুণা কুড়াতে চায়নি। যদিও সেসব দুঃখময় পর্ব আজ অতীত স্মৃতিমাত্র। বাবা মা কেউই এখন বেঁচে নেই। দু'বোন সুপাত্রে বিবাহিতা। নিজে কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।
সে সম্পর্কে বাণীকে সে কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বুক

উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলল, আমি জানি তুমি আমাকে সত্যিকার ভালবাসতে এবং এখনো ভালবাসো। সেইজন্যেই তোমাকে ঠকাতে চাইনি। আসলে, সে সময় আমাদের দু'জনের মিলন পর্বতপ্রমাণ অসম্ভব দিয়ে ঘেরা ছিল। সে জন্যই তোমাকে এড়িয়ে গেছি।

—কিন্তু তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বিয়ের পরও বিশেষ বিশেষ কোন মুহূর্তে তোমাকে ভীষণ মনে পড়ে। তখন মনে হয়, জীবনে এমন অনেক কিছু গুপ্ত অনুভূতি আছে যাকে ব্যবধান দিয়ে দূরে রাখা যায় না। অর্থাৎ, মন জুড়ে বসে থাকা সেই দুর্বল অনুভূতিকে তাড়াতে হলে সমস্ত মনটাকেই মেরে ফেলতে হয়।

—তোমার সেই নির্মল পবিত্র মনটার প্রতি আমার কিন্তু আজও গভীর শ্রদ্ধা আছে। ভেবে দেখতো আমাকে কী দায়ী করা চলে ?

—না। একটুকুও না। ভুলটা আমারই। আমি জানতাম, তোমাকে পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি প্রেমে পড়ার মত ছেলেই নয়। প্রেমের জন্য যে স্থিতি দরকার তা তোমার মধ্যে ছিল না। তবু কেন যে অমন হয়ে গেল—ভাবতে অবাক লাগে।

এতক্ষণ বেয়ারা ছেলেটা হয়তো অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। নয়তো অল্প বয়সে অধিক অভিজ্ঞতাতেই অনুমান করেছিল, অনেকের মত এরাও শুধু খেতে নয় দু'দণ্ড নিরিবিলি সময় কাটাতে এসেছে। তাই প্রথমে সেই যে দু' গেলাস জল দিয়ে গেছে আর এদিকে আসেনি। এখন এলো। কাছে এসে অর্ডার সম্পর্কিত নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াতে ওদের দু'জনের কথায় ছেদ পড়ল। ওরা দু'জনে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেষে বাণীই জিগ্যেস করল, কী খাবে বল ?

—যা খুশি বলে দাও।

—না না, তুমিই বলো।

শিবাজী খাবার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইল না। দুপুরের লাঞ্চটা খুব হেভী হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আজকাল চপ কাটলেটে তার খুব একটা রুচি নেই। সে চাইনীজ খাবারই বেশি পছন্দ করে। চিলি চিকেনের সঙ্গে ড্রিংকস্ হলে তো কথাই নেই।

বেয়ারা ছেলেটা ওদের দু'জনকে অর্ডার নিয়ে কাটাকুটি খেলতে দেখে সময় অপচয় করল না। মেনু কার্ড সামনে রেখে ব্যস্ততার সঙ্গে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আপনারা ঠিক করুন—টেবিল ঠুকে আওয়াজ দেবেন। আমি আসব।

বাণী লজ্জা পেয়ে বলল, ছি ছি কী ভাবল বলতো ! তারপর মেনু লিস্টের

ভাঁজ করা পাতা দু'টো খুলে ধরে জিগ্যেস করল, বল কোনটা তোমার পছন্দ— সুইটস্, কোল্ড ড্রিংকস্ না হেভী ফুড ?

—লাইট কিছু নাও।

—এতক্ষণ বসে থেকে তা হয় না। তুমি বরং সলিড কিছু খাও। সকালে কখন খেয়ে বেরিয়েছো ?

ঠিক সেই পুরনো প্রশ্ন। শিবাজীর মনে পড়ে গেল, কলেজ জীবনে বাণী ঠিক এমনি হৃদয় ছুঁয়ে প্রশ্ন করত। মফস্বল থেকে ট্রেনে করে সে কলেজ আসতো। নানা কারণে সব দিক সামলে প্রথম ক্লাস এ্যাটেণ্ড করার জন্য অনেক দিনই স্নান খাওয়া হত না। বাণী কেমন করে যেন ঠিক বুঝে যেত, কবে তার খাওয়া হয়নি। জিগ্যেস করলে সে কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারত না। চুপ করে থাকত। বাণী একরকম জোর করেই তখন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। নিজের ব্যাগ থেকে বিলটা মিটিয়ে দিত। কোন আপত্তিই শুনতো না।

অতীতের সেসব স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা দিনের তাৎপর্যময় ঘটনা শিবাজীর বিশেষ করে মনে পড়ল। দুপুরে আচমকা প্রবল বৃষ্টিপাতে কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় তখন অথৈ জল। ট্রাম বাস বন্ধ। ক্লাস শেষে বাণী বলল, চল কোথাও বসে চা খাওয়া যাক। ততক্ষণে জল নেমে যাবে। শিবাজী প্রত্যুত্তরে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিল, চা খাওয়ার নাম করে সেইতো তোমার জোর করে হেভী ফুড খাওয়ানো—দরকার নেই। তার চেয়ে ফাঁকা কোন ক্লাসরুমে বসে গল্প করি চল।

বাণী উচ্ছ্বসিত হাসি ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, বেশতো আমি কোন জোর করবো না। তুমি যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবো।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ সত্যি।

—যা খেতে চাইবো তাই খাওয়াবে ? শেষের কথা দু'টোতে বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল শিবাজী।

—হ্যাঁ তাই খাওয়াব। হালকা মেজাজে জবাব দিল বাণী।

—বলছো বটে পারবে না। কথাটা বলে শিবাজী বেশ অর্থপূর্ণ হেসেছিল। সেই হাসিটা আত্ম অহংকারে আঘাত করায় বাণী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিল, কিছু কেনাকাটা করবো ভেবেছিলাম সেটা না হয় আজ করবো না। চল, দেখবো তুমি কত খেতে পার।

একরকম জোর করেই শিবাজীকে নিয়ে পর্দা ঢাকা কেবিনে ঢুকেছিল। ঢুকেই জিগ্যেস করেছিল, বল কী খাবে—কত খাবে তুমি।

—খুব বেশি না, সামান্যই। কিন্তু তুমি কিছুতেই খাওয়াবে পারবে না, আমি তা ভাল করেই জানি।
কথাগুলো এত শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে দেখে বাণী হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। নির্বাক চোখে চেয়ে থেকে বেশ কিছুক্ষণ কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে এক ঝিলিক দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে চোখের মণি দুটো নাচিয়ে জবাব দিল, দুষ্টু কোথাকার। ভীষণ অসভ্য তুমি।
—মানলাম, আমি দুষ্টু অসভ্য ; কিন্তু তুমি হার মানছো তো ?
—মোটেই না। তুমি যদি খেতে পার, আমিও খাওয়াতে পারবো।
—না, তা তুমি পারবে না।
—দেখই না পারি কিনা।
বাণী কিছুটা খেলার ছলে আর জেতার তাগিদে অত্যন্ত হাল্‌কা মেজাজে চোখে চোখ রেখেছিল। তারপর ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো নীরব সম্মতিতে শিবাজীর মুখের কাছে পেতে ধরেছিল। ওর চোখের তারা দু'টো দারুণ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছিল। অথচ, বাণীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শিবাজী সেদিন শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল।
সেদিনের শিবাজী আজ অনেক পাল্টে গেছে। এখন তার পরনে ধুতি পাঞ্জাবী আর কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগের পরিবর্তে দামী স্যুট বুট টাই। হাতে অভিজাত এ্যাটাচিকেস। ডান হাতের কব্জিতে বিলিতি ঘড়ি। মানসিকতা অনেক পাল্টে গেছে। পাপপুণ্য প্রতারণা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম সেণ্টিমেণ্টগুলো খুব একটা নেই বললেই চলে। সে এখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয় বলেই যা কিছু এজীবনেই ভোগ করে নিতে তৎপর ; এবং এখনই।
অনেকক্ষণ নীরব থাকায় পর পুরনো স্মৃতির ইতি টেনে শিবাজী সোনালী কেস থেকে কিং সাইজ বিলিতি ফিল্টার টীপ সিগারেট বের করল। ঠোঁটে ঝোলালো। সুদৃশ্য লাইটারের নীলাভ ফুয়েলে আগুন ধরালো। সুগন্ধী স্নিগ্ধ ধোঁয়ার রিং ছড়ালো। তারপর টেবিলে রাখা সানগ্লাসটা আলতো করে নাড়তে নাড়তে জিগ্যেস করল, তোমার ভয় করছে না বাণী ?
—কীসের ভয় ?
—স্বামী সন্তান সংসার থাকতেও এই যে কবেকার ছাত্র জীবনের কোন এক বন্ধুর সঙ্গে একা কেবিনে এখন সময় কাটাচ্ছো।
বাণী তাৎক্ষণিক কোন জবাব দিতে পারল না। নিরুত্তর মাথা নীচু করে মেনুর ওপর নখের আঁচড় কাটতে থাকল। শিবাজী স্পষ্টত দেখতে পেল, বাণীর চোখ মুখ ক্রমশই ম্লান এবং বিষণ্ণ হয়ে আসছে। স্বভাবতই সে কিছুটা অপ্রস্তুত

হল। নিজের ভুল বুঝতে পারল। বাণীকে সতেজ সহজ করে তুলতে টুকরো হাসি ছড়িয়ে বলল, রাগ করলে? রসিকতাও বোঝ না? কী খাব জিগ্যেস করছিলে তো বলব?

নিমেষে বাণী পাল্টে গেল। দুঃখ ক্ষোভ লজ্জা উবে গেল। খাবার কথায় পরম উৎসাহে মুখ তুলে তাকাল। চোখ মুখে খুশির আলো ছড়িয়ে বিশেষ আন্তরিকতায় জিগ্যেস করল, কী খাবে বল। সেই কখন এসেছি। ওরা কী ভাবছে বলতো!

—যা খেতে চাই—খাওরাবে তো?

—বলেই দেখ না।

শিবাজী বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বাণীর দিকে চেয়ে থাকল। ওর চোখ মুখ চিবুক দেখল। ফ্যানের হাওয়ায় ওর কয়েকটা ছোট রেশমী চুল কপালের ওপর দিয়ে নাকের ডগায় দোদুল দোল খাচ্ছিল। বুকের কাপড় ঈষৎ শিথিল হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মসৃণ কাঁধ দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল হীরকের মত চোখের মণি দু'টো।

শিবাজী শরীরময় প্রতিটি শিরায় অদ্ভুত উত্তাপ আর রক্ত চাঞ্চল্য অনুভব করল। অস্থিরতার সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, যদি ফেলে আসা সেই বৃষ্টিঝরা দিনটির মত বলি, খুব সামান্যই খেতে চাই? তুমি কিন্তু আজ আর কোনমতেই তা খাওয়াতে পারবে না।

আজকে, এই বিবাহিত জীবনে শিবাজীর বিশেষ ইংগিত ধর্মী কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে বাণীর বিন্দুমাত্র সময় লাগল না। লজ্জা সঙ্কোচ ভয়ে চোখ মুখ রক্তাভ কিংবা ম্লান বিবর্ণ হল না। বরং তাৎক্ষণিক দ্বিধাহীন অনায়াস—উত্তর দিল, শুনে হয়তো অবাক হবে তবু, সেদিনের মতই বলছি শোন, তুমি যদি খেতে পার—আমি নিশ্চয়ই খাওয়াব।

অনেক আগে থেকেই শিবাজী এরকম একটা সুযোগ-প্রতীক্ষায় গোপন মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে এককালে হাতের মুঠোয় পেয়ে হারানো বাণীকে আজ আর নতুন করে হারাতে ইচ্ছে হল না। সুতরাং বিনা ভণিতায় ঝটিতি ঝুঁকে পড়ে বাণীর ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো খুঁজতে থাকল। অথচ, আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে কিছুতেই পারল না। পরিবর্তে, চোখের সামনে বাণীর কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের ছোট্ট লাল বৃত্তটাকে ক্রমশঃ বিরাট একটা সূর্য হয়ে জ্বলতে দেখল।

সবুজ অরণ্যে আগুন

চাইবাসা যুবগোষ্ঠী আয়োজিত বাৎসরিক সাহিত্যসভার আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল, 'প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকছেন কলকাতার তরুণ সাংবাদিক সাহিত্যিক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।' সুস্পষ্ট সময়সূচী লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে, সময়টা মনে রাখবেন—সকাল ছ'টায়। আজকাল বিকেলে ঝড়ের জন্য প্রায়ই ইলেকট্রিক ফেল করছে, তাই সকালে ব্যবস্থা করেছি।

ওরা চলে যেতে আমি স্মৃতির পাতা নেড়ে দেখেছি। এ নামে অত্যাধুনিক কোন লেখকের নামও স্মরণে আসেনি। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসও জন্মায়নি। কলকাতায় নিত্য-নতুন লেখকের জন্ম হয়। তাদের ক'জনাই বা সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তাছাড়া, এখানে বসে ক'জন নতুন লেখকেরই বা খবর আমরা পাই।

এ ক্ষেত্রে 'কলকাতা' শব্দটা যে বিশেষ অর্থবহ তা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। কলকাতা সম্পর্কে এখানকার লোকদের একটা মানসিক দুর্বলতা আছে। আমারও! এটা ঠিক এখানকার লোকদের একচেটিয়া ধর্ম নয়। বরং আরো ব্যাপক। বাংলা দেশের বাইরে শহর কলকাতার লোকগুলির বিশেষ একটা সমাদর আছে। কলকাতার লোক শুনলেই পরম উৎসাহে তারা ঘনিষ্ঠ হতে চায়, আচার আচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়।

এমনি একটা উদ্দেশ্যহীন অহেতুক আকর্ষণেই সেই বহুল প্রচারিত অতিথির কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সময়সূচী মেনে ঠিক সকাল ছ'টায়। তখন কি আর জানতাম যে, সে বিস্ময়-চমকে জিজ্ঞাসা করবে, আরে রিক্তা তুমি এখানে? তারপর বেশ খানিকটা বৃষ্টিঝরা মিষ্টি হেসে বলবে, কেমন আছো?

আমি চমকিত হলাম কিন্তু চমকালাম না। অপ্রত্যাশিতের একটা দোলা লাগলো। সে তখন মঞ্চে আসন নিতে চলেছে। আমি বললাম, পারলে বিকেলে যেও। দেখে এসো কেমন আছি। কাছেই সেনতলার মোড়ে থাকি। রিক্শা-অলাকে বললেই ঠিক জায়গামত পেঁছে দেবে।

আমি কেমন আছি?—এ বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। আমি নিজেই জানি না, কেমন

আছি। পিছনে দৃষ্টি ফেলে খুঁটিয়ে যাচাইও করিনি কোন দিন। তাই হিসেবটা আজও মেলানো হয়নি। দুপুরে খোলা জানলায় মুখ রেখে এসব ভাবনার আঁক কষতে কষতে মনে হল দেবাশিস যেন আজ আমাকে নতুন করে জাগিয়ে দিল। চোখের পাতাজোড়া এক করে বিক্ষিপ্ত মনকে একটা কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলাম। আর তখনি অনেক কালের স্তব্ধ স্মৃতিটা নড়েচড়ে উঠলো। ঠিক বাতাসে দোল খাওয়া পাতার মত।

আমার ভাবতে ভালো লাগলো, আজকের প্রধান অতিথি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় আমার এককালের বড় প্রিয়জন। কলেজ জীবনের বেশ কয়েকটা বছর যখন কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম তখনকার সুখদুঃখের সঙ্গী। সেই তখন থেকেই ভালবাসাবাসি। মান অভিমান। রোদ-বৃষ্টি। হোটেল-রেস্তোরাঁ কফিহাউসে আড্ডা। একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখা। কখনও-সখনও নিরিবিলিতে চুমুটুমু ইত্যাদি।

সে বেশ কয়েকটা উজ্জ্বল উচ্ছল বছর। কিন্তু বিয়ে আমাদের হয়নি, সম্ভবও ছিল না। লোকে মনে করে, এসব ফষ্টিনষ্টি। আমরা মনে করি না। আমরা জেনেছি, ভালবাসা সহজ কিন্তু বিয়েটা রীতিমত একটা সমস্যা। সমস্যা বৈকি, নয়তো এত দায়িত্ব নিয়ে এখানে জড়িয়ে থাকবো কেন। বরং সাত পাঁচ না ভেবে দেহ মনের দুর্বার তাগিদে ঝপ করে গলায় মালা জড়িয়ে ঝুলেই পড়তাম। পারিনি বলেই ছাড়াছাড়ি। কিছুকাল চিঠিতে প্রেমের উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা ছিল। কিন্তু আপন আপন ব্যস্ততায় আমরা ক্রমশই মানসিক ব্যবধানের জগতে চলে যাচ্ছিলাম। চিঠি লেখালেখিতে শৈথিল্য এসে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে অল্পকথায় খবরাখবর বিনিময় হত মাত্র। তারপর এই চাইবাসায় এসে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

কেন জানি না প্রথম থেকেই এই জায়গাটায় আমার মন বেঁধেছিল। সেই বাবা যখন বদলির চাকরিতে ঘুরে ঘুরে জীবনের শেষ কটা বছর চাইবাসা স্টেশনে থমকে দাঁড়ালেন। একটা স্থিতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন, তখন কখনো মনে হয়নি আমি বাংলার বাইরে আছি। এখানকার বাতাসে কেমন যেন একটা বাংলার গন্ধ। মনে ও প্রকৃতিতে তেমনি একটা স্বাদ। হয়তো এ আমার মনের ভুল। তবু সেই ভুলের সন্তুষ্টিতেই এতটা কাল আমি তৃপ্ত। সেই তৃপ্তিতেই আজো এখানে অনেক জ্বালা নিয়ে জড়িয়ে আছি।

চাইবাসা স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক থাকাকালীন বাবা মারা যান। বিকেলের ক্লান্ত রোদ্দুর গায়ে মেখে প্লাটফর্মে পড়ে থাকা তাঁর মৃতদেহটা নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া হয়েছিলো। অথচ মৃত্যুর সত্যিকারের কারণের কোন হদিস মেলেনি। মিলবে

না তা আমি জানতাম। সবকিছু তো আর এক্সরে কিংবা ময়না তদন্তে ধরা পড়ে না।'

আমি জানতাম বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে অনেক দিন থেকেই তিনি নিভে আসছিলেন। সংগ্রামের তো আর শেষ নেই, শুধু নেতৃত্ব বদল মাত্র। বাবার অবর্তমানে আমি তাই নেতৃত্বে এলাম। এখানে স্কুল মাস্টারী নিলাম। ছোট দু' ভাই-বোন মা আর আমি মিলে চারজনের জীবন-সলতের তেল জোগাতে একের পর এক অনাস্বাদিত ঋতুগুলোকে অনাদরে পাশ কাটিয়ে চললাম।

এখনো তেমনি ভাবেই চলেছি। ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির মত তার গতি। বিরামবিহীন চলা। চলছি আর জ্বলছি। ঠিক মোমের মত নিজের দেহটাকে গলিয়ে গলিয়ে নিরন্তর জ্বলা। শুধু অন্নবস্ত্র নয়, ওদের শিক্ষা চাই এবং ভাই-এর প্রতিষ্ঠা, বোনের বিয়ে। আরো অনেক, অনেক কিছু বাকি। এখনো অনেক আলোর দরকার। তত দিন আমাকে জ্বলতেই হবে। কোন অবসর কিংবা বিশ্রাম নয়। সবটুকু সময় শুধু আরো বেশি রোজগারের নিত্যনতুন প্রচেষ্টা।

দেবাশিস এতসব জানে না। জানানো দরকারও মনে করিনি। ওর নিজেরই যে শতেক সমস্যা তা আমার অজানা নয়। সেখানেই বিয়ের প্রথম বাধা এসেছিল, সেই যখন ওর মার মৃত্যুর পর বাবা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন ; একরাশ সমস্যা— অন্ধকারে ডুবে থেকে ওর সমস্ত রোমাণ্টিকতা উবে গেল।

ওর এক ভাই তখন বিলেতে। পড়া শেষ করে ফিরতে বছর তিনেক লাগবে। বাকি পাঁচটি নাবালক ভাই-বোনের সর্বময় দায়িত্ব ওকেই নিতে হল। সে-ক্ষেত্রে আমাকে নিয়ে নতুন কোন ঝুঁকি নিরর্থক—এ ছিল আমাদের সেদিনকার মতৈক্যের দ্বৈত সিদ্ধান্ত।

বিলেত থেকে ওর ভাই যখন ফিরে এলো দেবাশিস ততদিনে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে। দুই ভাই মিলে ক্রমশই যখন সংসারের ঘাটতি কমিয়ে পরিপূর্ণতা ফিরিয়ে আনছে আমি তখন বাবার হয়ে সবে লড়াই শুরু করেছি। বাবা প্রায়ই ভুগছেন এবং ক্ষীণ হয়ে আসছিলেন। আমি যতটা পারছি ছেলেমেয়ে পড়িয়ে বাবার হাতে তুলে দিচ্ছি। সে সময় দেবাশিসকে নিয়ে আমিও কোন ঝুঁকি নিতে ভরসা পেলাম না। স্বভাবতই তখন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। তারপর আজ দেখা। একরাশ ক্লান্ত বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার এ অধ্যায় নিয়ে ভাবনার সমাপ্তি টানলাম। অগোছালো আটপৌরে ঘরটাকে যতটা পারি সুশোভন বিন্যাস করতে উৎযোগী হলাম।

দেবাশিস একটু বেলাবেলিই এলো। দরজার মুখে পা রেখেই ব্যস্ততা দেখিয়ে

বললো, একটু তাড়াতাড়িই এলাম। পাঁচটা একুশের ট্রেনটা ধরতে হবে—জামসেদপুর যাবো। ওখান থেকে কালকে কলকাতা।
আমি সযত্নে বসতে দিয়ে বললাম, তা যেও, ট্রেন বহু আছে—ছ'টা পঞ্চান্নয়··· আর সাতটা একচল্লিশেও আছে।
—না না সে অনেক রাত হয়ে যাবে।—দেবাশিস আবার ব্যস্ততা দেখালো।
—দেখা যাবে। এসেছো তুমি, যাওয়াটা আমার হাতে। কিন্তু জামসেদপুর কি ব্যাপার? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
—সে কথা জানানোর সুযোগ আর দিলে কোথায়? তার আগেই তো হারিয়ে গেলে। নতুন ঠিকানাটা পর্যন্ত জানালে না। আর সে জন্যেই হয়তো—
—বুঝেছি, বিয়ে করেছো এই তো। শ্বশুরবাড়ী জামসেদপুর। তিনি এখন ওখানেই, তাই কিনা? ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে আমিই বলে গেলাম।
নিতান্ত অপরাধীর মত দেবাশিস অস্পষ্ট আলতো জবাব দিল, ঠিক তাই।
আমার বুকের ভিতর দিয়ে একটা উত্তাল প্রবাহ বয়ে গেল। অশান্ত ঢেউয়ের মত ফ[illegible]-ফেঁপে উঠতে চাইল। খানিকক্ষণ দু'জনেই নির্বাক বসে রইলাম। তারপর সেই শীতল নিস্তব্ধতা ভেঙে বললাম, ভালোই করেছো। তা সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন, বেশ দেখতে পেতাম।
—যদি জানতাম তুমি এখানে আছো তাহলে নিয়েই আসতাম। এতক্ষণে বেশ খানিকটা ঝরঝরে হবার চেষ্টা করলো দেবাশিস।
আমি বললাম, বেশ এবার তো জানা রইল?
—নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো, বাড়ীর আর কাউকে দেখছি না যে? দেবাশিস প্রসঙ্গ পাল্টে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে।
—আর কেউ বলতে তো মা আর দীপা। অরুণ কলকাতায় থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। মা এই সময় রোজই মন্দিরে বের হন। দীপা স্কুলে গেছে কোচিং ক্লাসে। সামনেই ফাইনাল।
—আর বাবা?
বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে দেবাশিস বিস্মিত হলো। আক্ষেপ করে বললো, —জীবনে প্রথম তোমাদের বাড়ীতে এলাম। যাদের কথা এত শুনেছি জেনেছি তারা সকলে অচেনাই থেকে গেল।
আমি এই শোক আর ক্ষোভ পর্বের ইতি টানতে প্রয়াসী হলাম। ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাদের একটুখানি বাড়ী, এক টুকরো সব্জীবাগান খানিকটা পুকুর আর গোয়ালের গাই দেখালাম। পুকুর পাড়ে ডাঙ্গাজুড়ে

আম পেয়ারা কুল হরীতকী ইত্যাদি কিছু গাছ-গাছালি দেখাচ্ছিলাম। একটা কুল কুড়িয়ে মুখে ফেলে দেবাশিস বললো, বেশ মিষ্টি তো। আমি বললাম, ছেলেমানুষের মত কুড়িয়ে খাচ্ছো কেন ? ঘরে চলো অনেক আছে।
—কেউ তো আর দেখছে না, লজ্জা কিসের ? কথাটা বলেই বারমেসে পেয়ারা গাছ থেকে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে নিল। বেশ জোরে দাঁত বসিয়ে একাংশ চিবুতে চিবুতে সন্তৃপ্ত মন্তব্য করলো, বেশ ডাঁশা কিন্তু। মনে হচ্ছে, কাশীর পেয়ারা।
দেবাশিসের এই ছুটন্ত শিশু-চাপল্য আর খুশির আমেজ আমার ভালো লাগলো। বুঝতে পারলাম, শহরের কর্মব্যস্ত রাশভারী মনটাকে ও ছুটি দিয়ে কিছুটা খেলিয়ে নিচ্ছে।
ফিরতি পথে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা এই যা-যা দেখালে এসবই তোমাদের নিজের ?
—হ্যাঁ, বাবা মারা যেতে যে টাকাটা পেয়েছিলাম তাই দিয়ে আর কি !
ঘরে ফিরে হাতে তৈরী খাঁটি ঘিয়ে লুচি ভাজলাম। দেবাশিস সামনে মোড়ায় বসে টুকটাক কথা বলছিল। আমি জলখাবারের থালা সামনে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চা খাবে, নাকি দুধ দেব এক গেলাস ?
—চা তো রোজই খাই। আজ খাঁটি দুধের সুযোগটা ছাড়ি কেন ? বলেই এক গাল হাসলো। আমি দুধ এনে দিলাম। গেলাসে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির আওয়াজ তুললো, আহ্ এই না হলে দুধ। ক্ষীরের গন্ধ লেগে আছে। কিন্তু সহ্য হলে হয়, ভেজাল খেয়ে অভ্যেস কিনা। বেশ আছো কিন্তু তোমরা, ঠিক দেশের বাড়ীর মত। আমার ভারী ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে থেকে যাই এখানে।
এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে ওর কথাগুলো শুনছিলাম। কিন্তু বড় উচ্ছ্বাস মনে হল। বললাম, দু-এক দিনের জন্য বেড়াতে এলে তাই মনে হয়। যাক্‌গে, চল তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।
—আর আসা নয়, ফিরতি পথে সোজা স্টেশনে !
—সময় মত ঠিক পৌঁছে দেব। বেঁধে রাখার ক্ষমতা কি আর আছে ?
আমার চোখের দিকে দৃষ্টি ফেলে ও আলতো করে হাসলো। কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে নিরুত্তর রইল।
পাঁচটা বাজতে মসজিদের আজান আর রবিবার সকাল থেকেই গির্জায় অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি এখানে আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা সূত্রে একাত্ম হয়ে গেছে। মঙ্গলবারের হাটবাজারের মিলনতীর্থ সেই চেতনাকে আরো

সুসংবন্ধ করে তোলে। ওগুলোই আমার প্রশান্তি। ক্লান্তি বিলোপের অন্যতম সহায়ক। এই প্রচলিত ধারার বাইরে আজ দেবাশিসকে নিয়ে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করলাম।

পড়ন্ত রোদের উত্তপ্ত আবেশ গায়ে জড়িয়ে আমরা পায়ে পায়ে হেঁটে চলছিলাম। রোরো নদীর ব্রীজটার ওপর এসে রেলিং-এ হাত রাখলাম। দেবাশিসের হাতটা আমার হাতকে স্পর্শ করলো। আর তখনি কোথায় যেন একটা সংকোচের সুঁচলো কাঁটা বিঁধলো। বৃষ্টির জলে বাত ধরার মতো। চোখের পাতা ফেলে নিজেকে সংযত করতে সচেষ্ট হলাম। মুদিত চোখের সামনে দিয়ে অগুনতি ছাত্রীদের মিছিল করা মুখগুলো ভেসে গেল। সবশেষে এলো অরুণ আর দীপা। ওদের মুখ দু'টো সকরুণ ও বিষণ। ওরাই যেন আমার চলন্ত জীবনের ট্রাফিক। আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। দেবাশিস অবাক হল।

ওপারে চক্রধরপুর এপারে চাইবাসা। মধ্যিখানে যে পাহাড়টা গা এলিয়ে পড়ে আছে—ওকে আমরা পুটিদা-পাহাড় নামেই জানি। ওর পাশেই ছোট্ট গ্রাম পুটিদা। সেই সূত্রেই পাহাড়ের নাম, নাকি পাহাড়ের নামেই গ্রামের নাম তা অবশ্য জানি না। জানবার কথাও নয়। পুটিদা গ্রামে আজ পর্যন্ত কোন দিনই যাই নি। তবু ওখানকার লোকগুলোর সাথে একটা যোগসূত্র আছে। শুনেছি, এককালে ওখানে আখের চাষ হতো খুব বেশি। এখনো হয়, তবে কম। সেই আখের গুড় বেচতে ওরা চাইবাসায় আসে। অন্য সময় টমেটো বেগুন ও শীতের সব্জী কিংবা মুরগীর ডিমও নিয়ে আসে। এই আসা-যাওয়ার মধ্যেই কিছুটা জানাশোনা।

এসব কথাগুলো দেবাশিসকে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছিল। ওরই নির্দেশে বা অনুরোধে। নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য সম্পর্কে ওর দারুণ অনীহা। ও এখানকার সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে যেতে চায়, যা পরের কোন লেখায় পটভূমি হতে পারবে। বাকিটুকু কল্পনায় সেরে নেবে। আমার ভাবতে ভালো লাগলো, এই চাইবাসা আমি এবং দেবাশিসকে নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনী গড়ে উঠবে। বাস্তব কাহিনী।

একটু আগে পুটিদা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সূর্য ডুব দিয়েছে, যার আবীর রাঙা রেশ এসে পড়েছে আমার মুখে। দেবাশিস উচ্ছ্বাসে বলে উঠলো, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।

নীচে মন্দ-স্রোতা রোরো নদী। ভাঁজ খেলানো উচ্ছল তার পথ। আকাশের খানিকটা লালচে প্রসাধন মেখে সে বর্ণালী হয়ে উঠেছে। আমি সেদিকে ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে বললাম, ওর চেয়েও ?

—হ্যাঁ।

আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হলো না। দশ বছর আগে হলে যে কথাটা ভালো লাগতো আজ তা তীব্র ব্যঙ্গ মনে হল।

ব্রীজের পাশ দিয়ে খাড়া হয়ে পাথরের যে বড় সিঁড়িটা একদম জলের কিনারায় নেমে গেছে ওখানে হাটফেরতা অনেকের ভীড়। অপর পারে অশ্বত্থ গাছের তলায় বিস্তীর্ণ সমতলে বিচ্ছিন্ন আগুন জ্বলে উঠলো। ওগুলো বেদেদের রাতের অন্নের প্রস্তুতি পর্ব। আরো নীচে আবছা আলোয় অর্ধনগ্ন একটি আদিবাসী মেয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘষে মেজে স্নান সারছে। দেবাশিস দেখেও যেন না-দেখার ভান করলো। নগ্ন সৌন্দর্য সম্পর্কে ও হয়তো ইচ্ছাকৃত অসচেতন। ওর মতে হয়তো অশ্লীল। আমি মেয়ে হয়েও কেন জানিনা এর মধ্যে কোন অশ্লীলতা খুঁজে পেলাম না।

আমরা আরো এগিয়ে চলতে থাকলাম। সেই যেদিকটা পুটিদা পাহাড়, ওই দিকেই কোমরের ঢেউ খেলিয়ে পীচের রাস্তাটা চলে গেছে। ও পথে আজ অনেক ভীড়। দূর গাঁয়ের হাট-ফেরতাদের মিছিলে সামিল না হয়ে আমরা সরু মেঠো পথ ধরলাম। এ পথ আমার চেনা।

আদিবাসীদের বস্তি পেরিয়ে গেলেই একটা সাঁকো। এটা ওরা গ্রীষ্মে তৈরী করে, কিন্তু বর্ষায় ভেঙে যায়। এই সাঁকোটা পেরোলেই বিস্তীর্ণ মাঠ। তারপরেই চাইবাসা স্টেশন। সেই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী।

হঠাৎ একরাশ ধুলো উড়ে এলো। ঘূর্ণি হাওয়ায় পাক খেতে খেতে বেআব্রু মাঠটাকে বৈরাগীর বস্ত্র পরালো। তীব্র অশান্ত খেয়ালী হাওয়া আমাদের দু'জনকে অন্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তুললো। আমি অনুমান করলাম, ঝড় আসছে। ধুলো অন্ধকার আর দিগন্তব্যাপী সেই দারুণ জমাট নিস্তব্ধতায় ডুব দিয়ে দেবাশিস আমাকে জড়িয়ে ধরলো। অত্যন্ত বেশিরকম নিবিড় করে। আমি উষ্ণ প্রস্রবণের চাঞ্চল্য পেলাম। হাড়িয়া খাওয়া বেসামাল সাঁওতাল মেয়ের মত টাল খেলাম। আধো চোখে ধুলো এড়াতে চাইলাম। সেই মুহূর্তে দেবাশিস তার চাক্ষুষ অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে বেপরোয়া স্পর্শে বোঝাতে চাইল, আমি আছি।

আমি যেন ক্রমশই হারিয়ে যেতে থাকলাম। আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে থাকল। আমি সেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অস্তিত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠলাম। প্রবল ঝটকা মেরে নিমেষে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর ত্রস্ত পা ফেলতে থাকলাম।

চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো ঘুরপাক খেল। মনে হল, আজ আমার জীবনে বিবাহিত দেবাশিসের অস্তিত্ব যেন ঠিক এখানে। এখানেই তার নিরুক্ত পৌরুষ-প্রচার, 'আমি আছি।'
নয়তো কী? এই যে এতকাল পরে আজকে দু'জনে দেখা হল। এতটা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটালাম, সবটাই সৌজন্য আর আতিথেয়তায়। তাতে সুখ দুঃখের সমভাগী বা সমব্যথী হবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস ছিল না।
সাংসারিক প্রসঙ্গটা হয়তো ইচ্ছে করেই দেবাশিস এড়িয়ে গেল। কোন প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলো না যে, আমাদের কেমন করে চলছে। সেখানেই আমার ক্ষোভ। সমস্যা ছিল বলেই আমাদের বিয়ে হয়নি। কিন্তু ভালবাসাটা তো আর মিথ্যে নয়। তার জের টেনে আমি কোন সাহায্যেরই প্রত্যাশী নই। তবু যদি অন্তত একবারও বলতো, প্রয়োজনে জানিও—আমি আছি। এই আশ্বাসটুকুতেই আমি মুঠো ভরা শক্তি পেতাম।
এসব ভাবতে গিয়ে এই মুহূর্তে দেবাশিসকে আমি ঘৃণা করলাম। অবিশ্বাস এবং ঘৃণা।
দেবাশিস অপ্রস্তুত হলো। আমার লজ্জা রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, —রাগ করলে? রাগলে তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়, ঠিক সেই আগেকার মত।
এসব কথায় আজকাল আর আমার কোন অনুভূতি আসে না। আমি নির্বাক চলতে থাকলাম। অশান্ত পদক্ষেপ। স্থির নিশানা।
স্টেশনের আলোয় এসে দাঁড়াতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দুজনেই পিছন ফিরে ফেলে আসা পথটার দিকে তাকালাম। যতদূর দেখা যায় শুধু স্তূপীকৃত জমাট অন্ধকার। কিন্তু সমস্ত অন্ধকারের বুক চিরে পাহাড়ের গায়ে আগুনের মেলাটা আরো স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেছে। দেবাশিস সেদিকে নিষ্পলক চোখ চেয়ে ভাবালুতায় দাঁড়িয়ে থাকলো। দার্শনিক দৃষ্টিতে স্বগতোক্তি করলো। অস্পষ্ট দু' এক ছত্র কানে এলেও আমি তার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না।
আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী দেখছো অমন করে? ও বিন্দুমাত্র ভাব পরিবর্তন না করে জবাব দিল, পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তার ওই বাতিগুলো। নাকি সারিবদ্ধ মশালের মিছিল নেমে আসছে ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখ, নীচের দিকে নেমে এসে চক্রাকারে কেমন ঘুরে গেছে। ঠিক আলোর মালার মত দেখাচ্ছে তাই না?
—তা ঠিক। কিন্তু তুমি ভুল করেছো, ওখানে কোন রাস্তা নেই, ওগুলো মশালও নয়।

—তবে ?
—দাবানল। বন জ্বলছে।
—তুমি বুঝলে কি করে ?
—প্রতি বছরই দেখছি যে। এই তো সবে শুরু। চলবে মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত। সমস্ত বন উজাড় করে জ্বলবে। নয়তো বৃষ্টিতে তার আগেই নিভে যাবে।
—সে যাই হোক। এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য কিন্তু ভুলবার নয়। এক কথায় অপূর্ব। কথাটা বলেই ওর চটকা ভাঙলো। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে অবাক হল, আরে ট্রেনের দেখছি সময় হয়ে গেছে। টিকিট কাটতে হবে যে। সঙ্গে সঙ্গে বুকিং অফিসের দিকে ব্যস্ত পা বাড়ালো।
ট্রেন এলো। দেবাশিস মৃদু হাসলো। সামান্য ঘাড় নুইয়ে নীরবে বিদায় চাইল। আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই তার প্রত্যুত্তর দিলাম। ও ট্রেনে উঠে জানলার কাছে এসে বসলো। আমি প্লাটফর্মে নির্বাক দাঁড়িয়ে। কেন জানি না, ওর মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। নজর ছিল সামনে, সিগনালের নীল আলোর দিকে। তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ও আমার কাছ থেকে কিছু শোনার প্রত্যাশায় চোখ মেলে আছে। ট্রেন ছাড়বার আগে ওর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগলো আমাদের চাইবাসা ?
—দারুণ ভালো। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বললো, সব কিছুই যেন ছবির মত সাজানো। কিন্তু ওই যে মশাল মিছিল বা আলোর মালা যাকে তুমি দাবানল বলছো ওর তুলনা হয় না। ওটা এখানকার সব সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে।
প্লাটফর্ম ফাঁকা করে ট্রেনটা চলে গেল। দু'জনেই কিছুক্ষণ হাত নাড়লাম। তারপর স্থির হয়ে গেলাম। ফাঁকা প্লাটফর্মে বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে মনে হল, আমি কেমন আছি দেখলে ?—এই দ্বিতীয় প্রশ্নটা যে জিজ্ঞাসা করা হল না !
আমি জানি, এই চাইবাসা, পাহাড়ের দাবানল আর আমার বর্ণনা দেবাশিসের কলমে আরো সুন্দর ও বাস্তব হয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে বিন্দুমাত্র খুশি হতে পারলাম না। আনন্দে বুক ভরে উঠলো না। বরং শূন্যমনের দীর্ঘশ্বাসে অব্যক্ত এই কথাটা গুমরে গুমরে কাঁদলো, দেবাশিস, তুমি শুধু পাহাড়ের মিছিল করা জ্বলন্ত সৌন্দর্যটাই দেখলে, দহন জ্বালাটা বুঝলে না।

বিষয় গাছ, গৃহ

উঠোনের ওপর কুয়োতলায় একটা নিম গাছ। প্রতি প্রত্যুষে গাছটায় ছোট পাখিরা কিচিরমিচির ডাকে। বেশ মিষ্টি শুনতে। স্বদেশের ঘুম ভেঙে যায়। সকালে যেখানে বসে চা খায়—ভোরের নরম হলুদ রোদ্দুর এসে গায়ে পড়ে। রাতে শোবার বিছানায় জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে গড়ায়। জানলার সামনে বারমাস ফুলফোটা একটা শিউলি গাছ। মা মমতাময়ী লাগিয়েছেন। অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এনে। স্বদেশের খুব প্রিয় ফুল—শিউলি। গন্ধে বুক ভরে যায়। মনে হয়, আর কি আমার চাই।

খাটের নিচে প্লাস্টিকের একটা বড় বালতি। ভিতরে চাল রাখা থাকে। কোনো ঢাকনা নেই। চড়াই পাখিটা কেমন করে যেন জেনে গেছে। ভোরের রোদ্দুর উঠলে রোজ আসে। ফরফর শব্দ তুলে খুঁটে চাল খায়। ইতিউতি তাকায়। ছোট্ট পাখনায় ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে জানলার পর্দার দড়িতে বসে। দোল খায়। আবার আসে। চাল খায়। আবার যায়। যতক্ষণ পেট না ভরে এমনি করে। তারপর গ্রিলের ফাঁক দিয়ে পরম আনন্দে চলে যায়।

সকালের চা খেতে খেতে খবরের কাগজ থেকে স্বদেশের চোখ দুটো বারবার এদিকেই চলে যায়। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অন্যমনস্কতা আসে। ভাবে, আমি তো শুধুই দেখি। কিছুই বলি না—তবু, পাখিটার কেন এত ভয়। পাখিদেরও কী অপরাধবোধ থাকে! অথবা লজ্জা?

সুখ কাকে বলে স্বদেশ জানে—এটা তার অহং। ছোট্ট ছেলে টুকাই, এখনো আধো আধো বোল। অথচ, কখন তার বাবা অফিস থেকে ফিরবে—পথ চেয়ে থাকে। কলিং বেল অথবা কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চেঁচিয়ে ওঠে। জিগ্যেস করে, তে বাবা? ওর মা পৃথা দরজা খুললেই টুকাই দু'হাত বাড়িয়ে আনন্দে কোলে উঠে আসে। জিগ্যেস করে, তি এনে তো? ক্যাডবেরি হাতে পায়। কোনো কোনো দিন স্বদেশের ফিরতে একটু রাত হয়ে যায়। টুকাই ঠিক জেগে থাকে। অনুযোগের সুরে বলে, আমি ততবার বলোতি বাবা আতসে না। বাবা আতসে না। তুমি কি বাতে ধুলে ধুলে এতেতো?

কী জবাব দেবে স্বদেশ? সত্যিই তো বাসে ঝুলে এসেছে। অক্লান্ত পরিশ্রমের

পরেও পরিশ্রম। টুকাই-এর কথা শুনে সব ক্লান্তি উবে যায়। অফিস ছুটির পর আগে পৃথা টানত। এখন টুকাই টানে। বাইরের জগৎ থেকে ছোট্ট ঘরে। আলোয় ঝলমল পরিবেশ থেকে লোডশেডিং-এর অন্ধকার গুদাম ঘরে। তবু, এখানেই পরম সুখ, নিবিড় শান্তি মনে হয়।

স্বদেশের জন্য একটা ঘরই বরাদ্দ। পড়া লেখা শোয়া অথবা ব্যক্তিগত অতিথি অভ্যর্থনা—একই ঘরে। উপায় কী! যা ভাড়া আজকাল। সম্প্রতি সেলামী প্রথা চালু হয়েছে এই মফস্বল শহরেও। ভাড়াটে বসাবার আগে বংশ পরিচয় চাকরিগত যোগ্যতা পরিবারের লোকসংখ্যা—ইত্যাকার ঠিকুজি কুষ্টিও চাওয়া হচ্ছে। অবাঙালি ভাড়াটে সকলেরই বেশি পছন্দ।

সাজানো গোছানো পৃথক কাজে আলাদা ঘর—কার না ইচ্ছে হয়। পৃথা বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে বলে, যা অবস্থা—মালপত্তর ঘরে রেখে মানুষগুলো বাইরে থাকলেই ভাল হয়। আগে জানলে সোফা সেটটা বাবাকে দিতে বারণ করতাম। পৃথা হয়তো জানে না, এসব কথার কথা স্বদেশকে যন্ত্রণা দেয়। স্বদেশ ধনী বাপের মেয়েকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিল না। পৃথার বাড়ির লোকজনকে ঘরদোর বাথরুম এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কথা খুলেই বলেছিল। তবু, পৃথার ব্যবসায়ী বাবা শশিভুষণ বলেছিলেন, অর্থ তো আমাদের প্রচুর আছে। এডুকেশন এবং কালচারের বড় অভাব বোধ করছি বাবা। বড়লোকদের ওপর আমার মেয়েরও দারুণ অনীহা। ঘৃণাও বলতে পার। তাই জামাই হিসেবে তোমাকেই আমাদের বেশি পছন্দ।

যা কিছু নিয়ে স্বদেশের এত অহং—তার প্রতি যাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা—তাঁদের প্রতি স্বদেশের শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। সেকারণে, শেষ পর্যন্ত পৃথাকেই বিয়ে করেছে।

চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকা অভ্যাসটা স্বদেশের ছোটবেলা থেকেই। এখনো আছে। এখন অবশ্য চেয়ারের বদলে সোফায় বসে। চুপচাপ বসে থেকে মাঝে-মাঝে মনে হয়, এই ঘরে আমার বলতে কিছুই নেই। খাটবিছানা আলমারি ড্রেসিং টেবিল কিছুই নিজের নয়। বুক সেলফ আলনা সোফাসেটও বিয়েতে পাওয়া। টিভি টেপ রেকর্ডারও পৃথার বাবার দেওয়া। বিয়ের পর শশিভূষণ পৃথাকে বলেছেন, স্বদেশকে বলিস যদি আর একটা ঘর পায় তো ফ্রিজ আর ডাইনিং টেবিল কিনে দেব।

পৃথার সেজন্য বড় আপসোস—বাড়িওলা যদি সত্যিই তাদের প্রস্তাবমত আর একটা ঘর দিতেন। বাবা যা বলেছেন হয়তো তার চেয়ে বেশি কিছু এসে যেত। স্বদেশ অবশ্য ওসব নিয়ে মোটেই চিন্তা করে না। মাঝেমধ্যে একটা রিডিং

রুমের অভাব বোধ করে মাত্র। তার একান্ত নিজস্ব বলতে যা কিছু—সেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পত্রপত্রিকা এবং দুষ্প্রাপ্য বইগুলোর সঙ্গে টুকাই-এর খেলনা পুথার ওষুধ এবং কিছু শৌখিন শিল্পসামগ্রী—যেন যাদুঘর। কিন্তু, উপায় কী!

ইদানীং মমতাময়ী প্রায়শ দুঃখ করেন, নিজস্ব ঘরবাড়ি হল না এখনো। তাঁর দুঃখটা অনেক গভীরে। দেশ ভাগ হবার আগে সবই তো ছিল। নিজস্ব জমিজমা ঘরবাড়ি পুকুর গোয়াল খেতজমি। প্রায় জমিদারি। রিফিউজি হবার পর থেকে ভাড়া বাড়িতে। অথচ তখন কিছু বলতেন না। এখন বলেন।

তখন কিছু বলতেন না—তার পিছনে কারণ ছিল। ছেলেমেয়েরা নাবালক। স্বদেশের বাবা শিক্ষক সুধাংশুশেখর ছেলেমেয়েদের জীবনের শক্ত ভিত গড়তেই ব্যস্ত। বাড়িওলার দুর্ব্যবহারে সাড়ে তিন কাঠা জমি কিনেছিলেন। অথচ, সময়টা জমি কেনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। স্কুলের হেডমাস্টারির চাকরি থেকে কিছুদিন পরেই অবসর নেবেন। প্রথম মেয়ে দীপার বিয়ে ঠিকঠাক। বিয়ের জোগাড়ে দারুণ দুশ্চিন্তা এবং ব্যস্ততা। দু'দিন বাদে ঘরে নতুন জামাই আসবে। সেজন্য, বাড়তি ঘর ভাড়া চেয়েছিলেন। উদ্বৃত্ত ঘর থাকা সত্ত্বেও বাড়িঅলা দিতে রাজি হননি। তাঁর বিশ্বাস, বাড়তি ঘর না দিলে কষ্ট হবে। কষ্ট হলেই অন্যত্র উঠে যাবেন। তখন অনেক বেশি টাকাতে নতুন ভাড়াটে পাওয়া যাবে।

জমি কিনলেই বাড়ি হয় না। আবার বাড়তি ঘর না পেলেও মেয়েদের বিয়ে আটকে থাকে না। স্বদেশের বড় দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেল একে একে। ভগ্নিপতিরা বুদ্ধিমান। আসেন কম। এলেও রাত্রিবাস করেন না।

এখন মমতাময়ীর কোনো অভাব নেই। স্বামী জীবিত না থাকা সত্ত্বেও। তাঁর সুখ ভোগের জন্য ছেলেরা দেশ-বিদেশ থেকে হাত বাড়িয়েই আছে। শ্বশুরবাড়ি থেকেও মেয়েরা তাঁর জন্য যথেষ্ট করে। ঘন ঘন প্রণামী পাঠায়। উদ্দেশ্য একটাই—মাকে শেষ জীবনে সুখী করা। সেই সুখের সূত্র ধরেই মমতাময়ী নিজস্ব বাড়ি না থাকার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তোদের যদি এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকত তাহলে নির্ঘাত একটা বাড়ি করতিস। মা-র বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখে স্বদেশ বোঝাতে চেষ্টা করে, সব কিছু সকলের হয় না মা। বিষয়আশয় বাড়ি অনেকের রক্তে লেখা থাকে। আমাদের নেই।

মমতাময়ী বাগান করতে ভালবাসেন। ফুল এবং সবজিবাগান। অজস্র ফুলগাছ লাউ সিম পেঁপে এবং পেয়ারা গাছ পুঁতেছেন। ফুল ফোটে সবজি ফলে।

বাড়িঅলা যখন কর্মক্ষেত্রে কোম্পানির কোয়ার্টার্সে থাকতেন তখন সবজি ফল পৌঁছে দেওয়া হত। কোয়ার্টার্স ছেড়ে নিজের বাড়িতে দোতলায় চলে আসার পর থেকেই যত অসন্তোষ অশান্তি। একমাত্র বদমেজাজি ছেলের হুমকি, জমি যার ফসল তার। অনেকটা শ্লোগানের মত শুনতে। বাড়িঅলা মাত্রেই বোধহয় এরকম হয়। জমিদারি মেজাজ দম্ভ। ভাড়াটেরা যেন অধীনস্থ দুর্বল অক্ষম প্রজা। কয়েকশো বছরের খাজনা বাকির দায়গ্রস্ত।

সম্প্রতি বাড়িঅলা সম্পর্কে মমতাময়ীর অনেক অভিযোগ। ওপরতলা থেকে যত্রতত্র জল আবর্জনা ফেলা হয়। পাম্প বিকল অজুহাতে হঠাৎ হঠাৎ জল বন্ধ হয়ে যায়। জলনিকাশী পাইপ ফেটে দুর্গন্ধযুক্ত জল ঝরে। জোরে রেডিও চালানোয়, শব্দ করে কুয়োয় বালতি ফেলায় আপত্তি জানায়। এমনকি সম্মিলিত কণ্ঠে ঈষৎ উচ্চ উচ্ছ্বাস টুকাই-এর কান্নাও নাকি ওদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। আরো হরেক আপত্তি—অজুহাত। মেয়েলি বিদ্রূপ অশালীন মন্তব্য মেজাজ তো আছেই।

স্বদেশ মাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ভাড়া বাড়িতে থাকলে এসব একটু সহ্য করতেই হয়।

—তাই বলে রোজ রোজ অন্ধকার ভোরে গাছের সব ফুলগুলো তুলে নিয়ে যাবে! কিছু বলতে পারব না?

—আমি তোমাকে অনেক ফুল কিনে দেব। স্বদেশ শান্তির জন্য সহজ পথ দেখায়, ভবিষ্যতে অন্যের জমিতে আর কোনো শখের গাছ লাগিও না।

—যেগুলো লাগিয়েছি, কষ্টযত্ন দিয়ে এত বড় করেছি তার ওপর কোনো অধিকার থাকবে না! ভাবতে অবাক লাগে মমতাময়ীর। প্রশ্ন করেন, শুধু মাটির জোরে সব ওদের হয়ে যাবে?

স্বদেশ শান্তিপ্রিয়। তর্কে না গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে, যাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ফুল—তিনি তো সবই দেখছেন। ওতেই তোমার পুণ্যি হবে।

মমতাময়ী তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিয়ে অযথা তর্ক বাড়ালেন না। তর্ক জুড়লেন বাড়িঅলাদের সঙ্গে। স্বদেশ অফিস চলে যেতে। অপ্রীতিকর তর্কে তিক্ততার সমাপ্তি ঘটে দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

সাড়ে তিন কাঠার জমিদারের মেজাজ তখন তুঙ্গে। লেঠেলের মত লোক পাঠিয়ে মমতাময়ীর লাগানো গাছগুলো কেটে দিয়েছেন একে একে। ফলন্ত গাছ কাটলে নাকি অমঙ্গল হয়। সেই বিশ্বাসে মমতাময়ী বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাড়িঅলার বিশ্বস্ত পোষা কুকুর নেই। নির্দেশ মতো মমতাময়ীকে নিবৃত্ত করতে কিশোর ভৃত্যটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। চরম লজ্জা লাঞ্ছনা এবং উত্তেজনায়

মমতাময়ী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ডাক্তার এসে বলেছেন, মাইল্ড স্ট্রোক। ভয়ের কিছু নেই। এবারকার মতন বেঁচে গেছেন।

পঞ্চায়েতের বিপিনমাধব এবং চণ্ডীচরণ মোড়ের মাথায় বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিলেন। বাস থেকে নেমেই স্বদেশ ওঁদের মুখে খবরটা শুনল। বিপিনমাধব মন্তব্য করলেন, ভেরি স্যাড স্বদেশ। ভাইয়েরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। অথচ, কেন যে এখনো বাড়ি করছ না।

স্বদেশ বলল, মনটা ছোট হয়ে যাবার ভয়ে। মানুষের বাড়িটা যতই বড় হয় দেখবেন, আত্মাটা ততই ছোট হতে থাকে।

চণ্ডীচরণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, ঠিক তাই। পিতৃসম্পত্তির জন্যই আমরা ভাইয়েরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। শেষ বয়সে বাবা মা পর্যন্ত ভাগাভাগি হয়েছিল দু'ভাই-এর মধ্যে।

বিপিনমাধব বললেন, কথাতেই আছে বিষয় না বিষ। দেখছি তো চারদিকে বাড়ি বড়র কম্পিটিশন চলছে। ড্রেন রাস্তার দিকে কারও নজর নেই, এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না কেউ, তা হলে পাড়ার উন্নতি হবে কেমন করে ?

স্বদেশ আলোচনায় থাকল না। মমতাময়ীর অসুস্থতার খবর পেয়ে দূর থেকে শশিভূষণ এসেছেন। শিয়রের কাছে বসে আছেন। ছোটভাই বিদেশ এখনো ফেরেনি। ছোটবউ অমৃতা সম্ভবত রান্নাঘরে। পৃথা তার বাবার পাশেই বসে। ঘরময় শোকনিস্তব্ধতা। টুকাই হতবাক। চুপচাপ দিদার পাশে শুয়ে বই-এর পাতা উল্টে ছবি দেখছে। নিত্যকার মত ছুটে স্বদেশের কাছে এল না। কোনো কথাও বলছে না।

স্বদেশ এসে জিজ্ঞাসু চোখে কাছে দাঁড়াতে শশিভূষণ বললেন, ভয় নেই—ঘুমোচ্ছেন। তুমি নিশ্চিন্তে ফ্রেশ হয়ে নাও স্বদেশ। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।

স্বদেশ জরুরী কথাটা শুনল শশিভূষণকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পর্যন্ত পেঁাছে দিতে গিয়ে। শশিভূষণ বললেন, তোমরা সব ভাই তো বেশ প্রতিষ্ঠিত। বাড়ি করছ না কেন ?

স্বদেশ কোনো জবাব দিল না। মনে পড়ে গেল, বাবাকে কেউ বাড়ি করছেন না কেন—জিগ্যেস করলে জবাব দিতেন, ছেলেরাই আমার এক একটি বাড়ি।

স্বদেশকে চুপ করে থাকতে দেখে শশিভূষণ বললেন, অন্য ভাইরা রাজী না থাকলেও তুমি নিজে অন্তত একটা বাড়ি করো। অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি।

স্বদেশ বলল, অত টাকা কোথায় আমার ? লোন নিয়ে বাড়ি করলে কৃচ্ছ্রসাধনে সারাজীবন কেটে যাবে। সেসব কষ্টকথা ভাবতে ভাল লাগে না।

শশিভূষণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বললেন, কত আছে তোমার ? বাকিটা আমি দেব—তবু তুমি বাড়ি করো।
স্বদেশ অপ্রস্তুত। প্রস্তাবটা আত্মসম্মানে বাধে। এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল, তা হয় না। ভাইদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরবে। তাছাড়া, দরকারই বা কি—বেশ তো আছি। বারণ করা সত্ত্বেও গাছটাছ নিয়ে মা ঝামেলা করলেন তাতেই অশান্তি।
শশিভূষণ খুশি হলেন না। স্বদেশকে ভালভাবেই চেনেন। তাই বাড়তি কথায় গেলেন না।
কয়েকদিন পর মফস্বল শহরে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আবৃত্তি করতে গিয়েছিল স্বদেশ। সেখানে সীমার সঙ্গে দেখা। যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখত সেইসময় সীমার সঙ্গে আলাপ ভাল লাগা ভালবাসা। প্রায় বিশবছর পরে দেখা। ধূপগন্ধ-স্মৃতি রক্তে তিরতির প্রবাহ চাঞ্চল্য আনল। বড়রকমের স্রষ্টা হবার স্বপ্ন দেখত স্বদেশ। সীমাকে বলেছিল, আমি বোধহয় খাঁচায় বন্দী পাখি হয়ে যাচ্ছি। এভাবে বড় স্রষ্টা হওয়া যায় না। শেষের সেদিন সীমা বলেছিল, আমি তোমাকে নিঃস্বার্থ মুক্তি দিলাম স্বদেশ। অসীমে গিয়ে তুমি অনেক বড় হও।
সীমার অকাল-বৈধব্যের সংবাদটা স্বদেশ জানত। সে প্রসঙ্গে কোনো কথায় গিয়ে নতুন করে বিষণ্ণতা বাড়াতে চাইল না। সীমা বলল, কাছেই বাড়ি—যাবার সময় হবে তোমার ?
স্বদেশ আপত্তি করল না। রিকশা ডেকে দুজনে বসল। সীমা বলল, ভালই তো আবৃত্তি করো। আজকাল আবৃত্তির কদর বেড়েছে।

কোনো বিজ্ঞাপনে তোমার নাম তো দেখি না। রেকর্ড টেকর্ড হয়েছে কিছু ?
—কী যে বলো। স্বদেশ বলল, চর্চাই ছেড়ে দিয়েছি।
—গান ?
—গাইতে ভুলে গেছি।
—কবিতা লেখ না ?
—আসে না।
—তোমার লিটল ম্যাগাজিনের খবর কি ?
—শ্বাসকষ্ট আর রক্তাল্পতায় অনেকদিন আগেই মারা গেছে।
—তোমার সেই মিছিল শ্লোগান জনগণের জন্য আন্দোলন খাঁচা ভেঙে ডানা মেলে অসীমে উড়ে যাওয়ার কি হল ?
—ওসব কথা থাক।

—কী সুন্দর প্রতিমা গড়তে তুমি। তাও ছেড়ে দিয়েছ নিশ্চয়ই।
—সময় কোথায়।
—তাহলে আবৃত্তি করো কেন ?
—মাঝে মাঝে চিৎকার করে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে তাই।
সীমা আর কোনো প্রশ্ন জুড়ল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, আমি কিন্তু মুক্তিই দিয়েছিলাম।
—আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। স্বদেশ অসঙ্কোচে তাৎক্ষণিক জবাব দিল, তখন কী জানতাম! অসীম নয় সীমার স্থিতিতেই যা কিছু মহৎ সৃষ্টি।
সীমার বাড়িটা নদীর ধারে। বহুকালের পুরনোবাড়ি। বিবর্ণ জীর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনের মতো। ঝোপে জঙ্গল ঝুল দুর্গন্ধ সর্বত্র। অন্ধকার সেঁৎসেঁতে ঘরদোর। টিকটিকি ইঁদুর আরশোলা ইতস্তত। অযত্ন—ঘরের মালিন্য বাড়িয়েছে আরো বেশি।
চা জলখাবার খেতে খেতে স্বদেশ বলল, কে কে থাকেন এখানে ?
—কেউ না। আমিও না। শুধু দু'ঘর পুরনো আমলের ভাড়াটে আছে।
—তুমি কোথায় থাক ?
—অনেক দূরে গ্রামে। প্রাইমারি স্কুলে পড়াই। ওরাই থাকতে ঘর দিয়েছেন একটা। মাঝে মাঝে এখানে আসি।
—তোমার ছেলে ?
সীমা অবাক হয়ে বলল, আমার ছেলে আছে জান দেখছি। মনে মনে খুশি হল।
স্বদেশ গর্ববোধ করল। কিন্তু কোনো মন্তব্যে গেল না।
সীমা বলল, ছেলে হোস্টেলে থেকে কলকাতায় পড়ে। খুব ইচ্ছা ডাক্তারি পড়ে ফরেন যাবে।
স্বদেশ বলল, ভাল খবর শোনালে। চল, নদীর ধারটা একটু ঘুরে আসি। ওখান থেকেই নাহয় চলে যাওয়া যাবে।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুজনে নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। পিছনে সাঁওতাল বস্তী ব্রীক ফিল্ড। সুন্দর করে সাজানো নদীর পাড়। ওপারে অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম। জোনাকির মত লণ্ঠন জ্বলছে। জলে ভাসন্ত বয়ারে টিমটিম আলো। দূরে লাইট হাউসে বাতি জ্বলছে। আকাশে শিউলি ফুলের মত লক্ষ কোটি তারা। ছল ছলাৎ জলের শব্দ ভাসছে। জ্যোৎস্নায় জল চিকচিক করছে। বাতাস বইছে এলোমেলো। সীমার চুল ওড়ে কাপড়ের আঁচল অবাধ্য হয়।

অন্তর্লীন বিষণ্ণতা আর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বুকে নিয়ে এবার দু'জনে নিরিবিলি নির্জন মসৃণ পিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস স্টপে এসে পড়ে। দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাক হয়ে যায়। একসময় গাঢ় নিঃশ্বাস ছড়িয়ে সীমা নিস্তব্ধতা ভাঙল।

—কেমন লাগল জায়গাটা ?

—খু-উ-ব ভাল। শান্ত সুন্দর। নদী গাছপালা পাখির ডাক ফুল ফল। খোলা আকাশ, বুকভরা বাতাস। নিরিবিলিতে সৃষ্টির উপযুক্ত জায়গা বটে।

প্রশ্ন উত্তরে দীর্ঘসময় কেটে যায়। অসীমের স্বপ্ন দেখা ক্লান্ত পাখিটা খাঁচায় বন্দী হতে চায়। সীমার মনে যেতে নাহি দেব তবু যেতে দিতে হয়—অর্কেস্ট্রা বাজে। বিদায়—বিষণ্ণতার শোকার্ত শীত গায়ে জড়িয়ে সীমা জিগ্যেস করল, বাড়ি করেছ—নাকি সেই ভাড়া বাড়িতেই আছ ?

—সেখানেই আছি—যে ঠিকানায় আমার গড়া প্রতিমা দেখতে গিয়েছিলে। ঘরের বড় অভাব। তোমার এতবড় ফাঁকা বাড়ি দেখে তাই লোভ হল।

—থাকবে এখানে ? চাও তো বাড়িটা কিনেও নিতে পার।

—আর তুমি ?

—বড় অর্থকষ্টে আছি। ছেলেকে বিলেত পাঠাতে হবে। অনেক টাকা দরকার। ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি করে দেব।

স্বদেশ কোনো জবাব খুঁজে পেল না। দুটি নির্বাক আর্ত ছায়ার মত দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাস স্টপটা বেশ আলো-আঁধারি। গাছের ঝুলন্ত দুলন্ত ডাল পাতার ফাঁকে ছায়া আলো দোল খেয়ে যায়।

বাসে ওঠার আগে স্বদেশ মন্তব্য করল, যত দারিদ্র্যই থাক আমার মতে, বসত-বাড়িটা বিক্রি না করলেই বোধহয় ভাল। রিটায়ার করে দাঁড়াবে কোথায়—গাছতলায় ?

সীমার বুকের ভেতর অগাধ জলে সহজ সাঁতারের সুখ। বলল, মেয়েরা জন্ম থেকেই তো গাছের তলায়। ভবিষ্যতের গাছটাকেই তো বাঁচাতে চাই।

এতক্ষণে এই প্রথম স্বদেশের খেয়াল হল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। টুকাই নিশ্চয়ই জেগে থাকবে।

সম্পদ টম্পদ

ধীরার এখন ভরা মাস। দেখতে বেঢপ লাগছে। সেবারের মত চোখ-মুখে সৌন্দর্য ফুটে ওঠেনি। মনে খুশি খুশি ভাবও নেই। বরং, ক্লান্ত বিষণ্ণ অপ্রসন্ন। অপ্রসন্নের কারণ, দ্বিতীয় সন্তানে সায় ছিল না। প্রথমবারের প্রসব স্বাভাবিকমতে হয়নি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তো ছিলই। সেইসঙ্গে দুঃসহ যন্ত্রণাটা আজও ভুলতে পারা যায় নি। পাঁচবছর পরেও সেসব ভাবতে গেলে গায়ে জ্বর আসে। মাথায় পাথর চেপে বসে। ভয়ে রাত্রে ঘুম আসে না। সুজনকে বোঝাতে চেয়েছিল, সবাই ছেলে চায়। ছেলেই তো পেয়েছ। অভাবের সংসার। আবার একটির দরকার কিসে !

সুজনের অন্যমত ঃ এক সন্তানে কোন বিশ্বাস আছে ? ওরও তো একটি সঙ্গী চাই। তাছাড়া, এক সন্তান মানেই আদরে বাঁদর।

অন্য একটা মতও আছে—যা সুজন মনে মনে ভাবে। অথচ, মুখে প্রকাশ করে না। কেননা, দ্বিতীয় চাওয়াটা হয়ত না মিলতেও পারে। তখন ধীরাকে কি করে মুখ দেখাবে। সেই গোপন অব্যক্ত ভাবনাটা হল, পুত্র মানেই সমস্যা। আজীবন দায়-দায়িত্ব কর্তব্য থেকেই যাবে। একালের ছেলেদের দেখছে তো। সত্যিকার মানুষ হবার সম্ভাবনা আর কতটুকু। ছেলে-বৌর কাছ থেকে শেষ বয়সে আঘাত পাওয়ার ষোল আনা আশঙ্কা আছে। কন্যা মানেই ঘরের লক্ষ্মীশ্রী। একটু ডাগর হয়ে উঠলেই বাবা মা-র প্রতি সে নজর দেয়া শুরু করবে। লেখাপড়ায় বেশি পণ্ডিত প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবনা-চিন্তা না করলেও চলবে। দেখতে শুনতে একটু চলনসই হলেই হল। মোটামুটি সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারলেই সব সমস্যার সহজ সমাধান। জামাইটি তেমন হলে তো কথাই নেই। ছেলে-বৌমার চেয়ে মেয়ে-জামাই ঢের বেশি দেখভাল করবে।

সুজনের এতসব দূরদর্শিতা ধীরা জানে না। জানে না বলেই রাগ ক্ষোভ অভিমান। পুরুষদের নিষ্ঠুর মনে হয়। তারা তো বাঁধিয়েই খালাস। সুজনকে তো দেখছে, দিব্যি স্বাভাবিক জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কোন খামতি নেই। ছ'মাসের মাথায় বাপের বাড়িতে গচ্ছিত রেখে বোম্বে ঘুরে

এল কত সহজে। হোক না সেটা অফিসের কাজে। মেয়েদের বেলায় যত শরীর খোয়ানো যন্ত্রণা জ্বালা। অন্ততঃ পনেরোটি মাস ঘর হয়ে যায় বন্দীনিবাস। তারপরেই কি মুক্তি আছে! কমপক্ষে প্রথম দুটি বছর বাচ্চাটার একটা না একটা অসুখ তো লেগেই থাকবে। প্রথম কয়েকমাস রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে না। আরো কত কিছু সমস্যা। সেসব ভাবতে ভয় হয়।

একটু আগে নির্ধারিত দিনের আউটডোর চেকিং-এ ধীরা দোতলায় উঠে গেছে। গত মাসগুলির অভিজ্ঞতায় সুজন জানে, তিন ঘণ্টার আগে ধীরা ফিরে আসতে পারবে না।

একটি বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল সুজন। যেসব খবর সাধারণতঃ পড়ে না আজ সেগুলিও পড়ছিল। স্রেফ সময় কাটানোর জন্য প্রতিটি শব্দ বাক্য যেন মুখস্থ করছিল। আজকাল খবরের কাগজে কতটুকু আর খবর থাকে। শুধুই তো বিজ্ঞাপন। সেটুকু পড়তে আর কতক্ষণ সময় লাগে। কাগজটা কোলের ওপর গুছিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকাতে মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। মহিলাটি আধুনিক সুশ্রী। সুন্দর পোশাক প্রসাধনে পরিপাটি সেজেছে। দেখে কে বলবে হাসপাতালে এসেছে। বয়স কত হতে পারে তা বোঝা যাচ্ছে না। নিজের বয়স শুধু যে মেয়েরাই লুকোয় তা নয়। অনেকের সৌন্দর্যই বয়সকে লুকিয়ে রাখে। এক্ষেত্রেও হয়ত তাই।

বেশ চেনাচেনা মুখ মনে হচ্ছিল সুজনের। তার ওই এক দোষ—দেখে অনেককেই চেনা চেনা মনে হয়। আবার অনেক সময় চেনা মুখকেও চিনতে পারে না। রুপালী পর্দায় নানা অনুষ্ঠানে এমনকি বহুল প্রকাশিত আলোকচিত্রের মানুষ-গুলিকেও চাক্ষুষ চিনতে পারে না। তাতে হয়ত কিছু এসে যায় না। কিন্তু, প্রিয় পরিচিত আপনজনেরা মানবে কেন। চিনতে না পারলে ক্ষুব্ধ হয়। অহংকারের গন্ধ পায়। অভিযুক্ত করে। শ্বশুর কুলের কাউকে না চিনলে তো সে অপরাধের কোন ক্ষমাই নেই। কতবার যে ধীরার অনুযোগ শুনেছে, আসলে তোমার ভীষণ অহংকার। ইচ্ছাকৃত না দেখার ভান করে আমার আত্মীয়দের এড়িয়ে যেতে চাও।

মহিলাটি ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। সুজনের আতঙ্ক হচ্ছিল। পাশের সীটটা ফাঁকা হতে মহিলাটি উঠে এসে বসল। হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা চাইল। উন্নাসিকভাবে না তাকিয়ে কাগজটা এগিয়ে দিল সুজন। তারপর সঙ্কোচের সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বসল। সিনেমার পাতায় মুখ রেখে মহিলাটি নিচু-স্বরে বলল, আমি এমন কিছু পাল্টে যাইনি সুজন। চেনা না-চেনার ব্যাপারে

তোমার চোখের দোষটা আমি জানি। তবু মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই তুমি না চেনার ভান করছ।

এতক্ষণে সুজনের আড়ষ্টতা ভাঙল। সহজ হয়ে মুখ তুলে তাকাল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল, বিশ্বাস কর বীথি, চেনা চেনা লাগছিল। চিনেও ফেলতাম আর কয়েকবার তাকালে।

তাকালে না কেন?

ভয়ে। তোমার দুপাশে শুধু যে মেয়েরাই বসেছিল!

তেমন ভীতুই আছ দেখছি। বৌকে নিয়ে এসেছ?

হ্যাঁ।

প্রথম?

না, দ্বিতীয়।

প্রথমটি মেয়ে বোধহয়—তাই আবার। কত বয়স হল তার?

না, ছেলে। পাঁচবছরের।

এক গোলে এগিয়েই আছ তাহলে। প্রথম মেয়ে হলে বোধ হয় ভয় পেতে। অথচ ফরোয়ার্ড খেলতেই হতো।

ভুল বুঝছ বীথি। আমার ভাবনা চিন্তাগুলো চিরকালই সাধারণ থেকে ব্যাতিক্রম, তাতো তুমি জানতে। হয়ত এখন মনে নেই। ও প্রসঙ্গ থাক। চল একটু বাইরে যাই। অনেকক্ষণ বসে আছি।

সুজন উঠে দাঁড়াল। ইশারায় ধারে কাছের মানুষজন দেখাল। বোঝাতে চাইছিল, এত লোজনের সামনে পারিবারিক আলোচনা তার অপছন্দ। তাছাড়া, দু'জনের অতীত সম্পর্কটাও প্রকাশ্য প্রচারের পরিবর্তে গোপন থাকাই শ্রেয়ঃ।

কোথায় যাচ্ছ? রাজপথে নেমে বীথি জিগ্যেস করল।

যে কোন একটা রেস্টুরেণ্টে। সেই সকালে সেকেণ্ড ট্রেন ধরে বেরিয়েছি। কিছু খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

এখানে তেমন কোন রেস্টুরেণ্ট নেই। বরং, হাতে সময় থাকলে আমার বাড়িতে চল। কাছেই ত্রিকোণ পার্কে থাকি।

বাড়ির কথা বলতে এতক্ষণে সুজনের খেয়াল হল, বীথি কার জন্য এসেছে তা এখনো জানা হয় নি। বাড়ির খবরও কিছু জানতে চায়নি। এবার জানতে চাইল।

বীথি ততক্ষণে পায়ে পায়ে পার্ক করা মারুতির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। বলল, আগে ওঠো। গেলেই সব জানতে পারবে।

সুজনের কাছে সব কিছুই বেশ রহস্যময় লাগছিল। কিছুটা রোমাণ্টিকতা।

বীথি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছে। সুন্দর ছাঁট শ্যাম্পু করা তার চুল। হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। সামনের রিয়ার ভিউয়ারে সানগ্লাস ঢাকা তার চোখ। লিপ গ্লসে মাখা কমলাকোয়া ঠোঁট। বেশ আকর্ষণীয়। এমন একজন সুশ্রী মডার্ন মহিলার পাশে বসে মারুতির মত গাড়ি চড়তে সুজনের খুব ভাল লাগছিল। ভাবছিল, বীথি এখন কার তা কে জানে। সবার আগে আমারই তো পাওনা ছিল।

মাত্র তিন মিনিটের পথ। মনক্ষুণ্ণ হয়ে সুজন ভাবল, রাস্তাটা আরও দীর্ঘতর হতে পারত।

গাড়িটা এখন ঝুলবারান্দার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। বনেদী বিরাট তিনতলা বাড়ি। সামনে ছোট্ট লন ফোয়ারা ফুল বাগিচা। দাঁড়িয়ে থাকা শ্বেতপাথরের একটি নারীমূর্তি।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে দোতলায় উঠল। স্প্যানিয়াল কুকুরটাকে বুকে জড়িয়ে বীথি বলল, এই ফ্লোরটা আমার। তিনতলাটা ভাসুরের। ওদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক নেই। নিচের তলায় দেওর থাকে। ছোট জাকে নিয়ে হাসপাতাল গিয়েছিলাম। প্রথম বাচ্চা হবে। পার্থ মানে আমার স্বামী ওখানকার অন্য ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার। সিরিয়াস পেসেন্টের জন্য রাত্রে গিয়ে আর ফেরেনি। খবর নিতে বসেছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ক'টি সন্তান তোমার ?

একটিও না। হবেও না।

বীথি বিষণ্ণ হল। সুজন অপ্রস্তুত।

স্পেশালিস্টরা কী বলছেন ? সুজন জিগ্যেস করল।

সেসব অনেক হয়েছে। পার্থতো চিকিৎসার জন্য বিদেশ পর্যন্ত গিয়েছিল। আমিও কোন দেবদেবী বাকি রাখিনি। আসলে যা হবার নয় তা কেমন করে হবে।

দোষটা তাহলে তোমার স্বামীর দিক থেকে ?

হ্যাঁ। শুধু আমরা দু'জনেই জানি। এখন তুমিও জানলে। পার্থ অবশ্য এখনো আশা ছাড়েনি। বিলিতি ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।

সুজন কথা বাড়াল না। একের পর এক ঘরগুলি পায়চারী করে দেখতে থাকল ! কী নেই ঘরে ! সর্বত্র চূড়ান্ত আভিজাত্য বিলাসিতার বহর। এক একটি ঘর যেন প্রদর্শনীর প্যাভেলিয়ন। অথবা সুসজ্জিত মিউজিয়াম। বই রেকর্ড ক্যাসেটের বিস্ময়কর দুর্লভ কালেকশান দেখে অভিভুত সুজন বলল,

এগুলো দেখে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছে।
বীথি ফ্রিজের নানা খাবার দিয়ে রাজসিক আপ্যায়ন করল। স্টিরিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের লং প্লেয়িং রেকর্ড বসাল।
সুজন সোফায় বসে। সামনে ডিভানে আধশোয়া বীথি। ঘরময় অন্তর্লীন বিষণ্ণতা হিমশীতল নীরবতা। গানের সুরে ভর করে প্রতিটি শব্দ বাক্যের গভীর অর্থ মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল।
কেমন দেখছ আমাকে? বীথিই প্রথম নীরবতা ভাঙল।
ভালই তো। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তাইতো পেয়েছ। ভাগ্যিস তখন আমার পাগলামিকে প্রশ্রয় দাওনি। তাহলে চিরকাল দুঃখী অতৃপ্তই থেকে যেতে।
লজ্জা দিও না সুজন।
বীথি উঠে বসল। বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলল, ভালবাসা ব্যাপারটাই বুঝতাম না তখন। শুধুই ভেসে বেড়াতাম। মনের কোন গভীরতাই ছিল না। তাই—
তাই কী?
সারা জীবনে সুখ কাকে বলে তাও জানলাম না।
কী লাভ এখন এসব ভেবে?
তুমি তো ভীষণ ভালবাসতে আমাকে—তাই না সুজন?
এখনই কী ঘৃণা করি? ভালই তো বাসি?
সত্যিই যদি তা হয়, একটা জিনিস দেবে আমাকে?
কী সে জিনিস? যদি ক্ষমতার মধ্যে হয় নিশ্চয়ই দেব।
সম্ভব জেনেই তো চাইছি। যদি সত্যিই দাও তো আজীবন ঋণী কৃতজ্ঞ থাকব।
বললাম তো আমার ক্ষমতা সীমিত। দেয়ার মত হলে নিশ্চয়ই দেব।
তখন লোভের কথা বলছিলে। শুধু বই রেকর্ড ক্যাসেটগুলি কেন, আমার যা কিছু ধনসম্পদ দেখছ—সবকিছুই তোমাকে দিয়ে দেব। আমাকে তুমি শুধু একটি সন্তান দাও।
শেষ গানটির পর স্টিরিও স্তব্ধ। সুজন বিব্রত।
ডিভান থেকে বীথি উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট চোখ শরীরে প্রার্থনা আকুতি। সুজনের পা জড়িয়ে বলল, সব দেবতাই তো শেষ পর্যন্ত পাষাণ থেকে গেল। সামনে তুমিই এখন জীবন্ত দেবতা। তোমার তো হৃদয় মন প্রাণ আছে। আমাকে বুঝতে পারছ না? আজ এত কাছে পেয়ে কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না।

পায়ে জলের স্পর্শ পেল সুজন। বীথি কাঁদছে। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগল। ভাবল, এই সেই বীথি যে এককালে রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তার উপস্থিতি সান্নিধ্য স্পর্শ সমস্ত শরীরে তীব্র রক্তপ্রবাহ আনত। চঞ্চল উত্তেজনায় শিরাগুলি বেসামাল হয়ে পড়ত। আজ নির্জন নিরাপদ সৌখিন ঘরে মুঠোর মধ্যে তাকে একা পেয়েও শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না কেন! তবে কী সে অক্ষম পুরুষ হয়ে পড়ছে?

অসহায় ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া সুজনের মনে নানা ধর্মকথার দ্বন্দ্ব দোলা চলল। একথা ঠিক যে, সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারীর কাছে রাজঐশ্বর্য বৃথা। আর, উপস্থিতা রমণীকে গ্রহণে গৃহীদের কোন দোষ হয় না। বরং বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলেই শাপ ও দোষভাগী হতে হয়। ধর্ম থেকে সত্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, শাস্ত্রে তো এমন কথাও আছে, পরধন বিষবৎ। পরস্ত্রী জননীবৎ। তাই বলে বীথিকে কোনমতেই জননীবৎ ভাবা চলে না। সুজন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দীর্ঘক্ষণ দেবতাদের মত অনড় মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুজন। একসময় আকস্মিক বিহ্বলতা কাটিয়ে করতলে বীথির চিবুক নিয়ে কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল। চুলের অরণ্যে হাত বুলিয়ে বলল, তোমার এত ধনসম্পদ কত সহজেই দিয়ে দিতে পারছ। কিন্তু আমার সম্পদ দুটি যে তার চেয়েও বড়। ধীরার গভীর বিশ্বাস আর আমার সততা কিছুতেই তোমাকে দেওয়া যায় না।

শূন্যবিন্দু

রাস্তার ধারে বড় গাছটায় পাতা ঝরছে তো ঝরছেই। আজ কয়েকদিন ধরে সমানে ঝরে চলেছে—রাশি রাশি অগুনীত পাতা ঝরছে। এরই মধ্যে গাছটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। কয়েকটা ডালে বাকি যে কটা পাতা আছে তাও ঝরতে দেরী নেই। বড়জোর কাল কিংবা পরশু। তারপর সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিঃসীম শূন্যতায় ভরে থাকবে গাছটা। কঙ্কালের মত হাড় বের করে দাঁড়িয়ে দুপুরের আগুনে জ্বলবে তো জ্বলবেই।

জানলার কাছে চেয়ারে বসে আমি দেখছি। কয়েকদিন ধরে সমানে পাতা ঝরা দেখে যাচ্ছি। এই সেদিনও সবুজ আটপৌরে সাজে ভরা যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছটা। অনেক ফুল ফুটেছিল। ফল হয়েছিল। সকাল সন্ধ্যা যত রাজ্যের পাখিদের জমাটি আড্ডা ছিল গাছটা জুড়ে। অথচ আজ বৈরাগ্যের বেশ পরেছে। বসন্তের পূর্বাভাস। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—রেডিওতে ঘন ঘন শোনা যাচেছ আজকাল। দু' কান ঝালাপালা। অন্তত আমার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে তাই মনে হয়।

পৃথিবীটাকে আজকাল মনে হয় শুধু শূন্যতায় ভরা। পৃথিবীটাকে একবার সত্যিকার দেখতে ইচেছ করে। বিশেষত দূরে ধান কলের ছাদ থেকে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রাগুলো উড়ে গিয়ে নোঙর করা জাহাজগুলোর উপর বসে; এবং সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে পঙ্গপালের মত সাদা গাঙচিলগুলো দিগন্তে বিন্দু বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন আমার উদাসী মন বিস্মৃতি এবং মুক্তি চায়। এক সময় ঘরের সীমাতেই দৃষ্টিকে শাসনে বন্দী করি। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে জমা ময়লাগুলো পরিষ্কারের বাসনা জাগে। বাঁশের ফ্লাওয়ার ভাসে লেখাটার দিকে নিবদ্ধ চোখ দু'টো মেলে ধরি। ওরই গায়ে এককালে সযত্নে লিখেছিলাম "ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো জীবনেরে তাই বাসি ভালো।"

সে অনেককাল আগেকার কথা। যখন আকাশকে সুন্দর দেখেছিলাম, প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিলাম। তখন স্বাদ গন্ধ অনুভূতিতে আজকের মত মরচে পড়েনি; তাই সবই মধুর মনে হতো। তখন যেন আমার চলনে বলনে একটা ছন্দ ছিল

—অনিমেষ অবশ্য তাই বলে থাকে। সেদিনও কিন্তু আমি শূন্য কলসি নিয়ে আজকের মতই জলের প্রত্যাশী। মাঝে মাঝে তাই সেই গঙ্গার জল আর খাবার জলের দৃষ্টান্তটা আমি খুঁজে ফিরি। কেননা দশ দশটি বছরের সিঁড়ি ভাঙতে আমি ক্লান্ত। রিক্ততার পাখা ঝাপ্টায় আমার সৌন্দর্য চেতনা উবে গেছে।

আমি আজকাল পড়ন্ত রোদের আলোতে প্রসাধন করে আগোছালো এলোচুলে সাঁঝের খেয়াঘাটের ভীড় দেখতে ভালোবাসি। সূর্যের যৌবন স্তিমিত হয়ে আসে, তারপর সন্ধ্যাতারার টিপ পরে। সন্ধ্যাতারা দেখে দেখে একঘেয়েমি এসে গেছে। কবে সেই শুকতারা দেখেছিলাম তারপর কত রাত, কত দিন। সন্ধ্যাতারা আর শুকতারা হয়ে এলো না।

প্রতিদিনের মত পশ্চিমের জানলা খুলে দাঁড়িয়েছিলাম। নোঙর করা মাছ-ধরা লঞ্চগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল কতকগুলো উলঙ্গ ছেলে। ওরা দৌড়ুচ্ছে খেলছে হাসছে। বাতাসে ভেসে আসা ওদের কথাগুলো বর্ষার জলের মত জলতরঙ্গ বাজাচ্ছিল আমার কানে। দূরে সূর্যের যৌবনচ্ছটায় ছোট ঢেউগুলো অদ্ভুত বর্ণালী জৌলুসে দুলছে। সমানে দুলছে। আমি হাসলাম কাঁদলাম এবং স্তব্ধ হয়ে নিজেকে নিজে অবজ্ঞা করলাম। ঘৃণায় সংকুচিত হলাম।

বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে কাঠের ছোট-ব্রীজটা শুরু হয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। ওরই প্রান্ত ঘেঁষে লতানো বুনো গাছটায় সুন্দর একটা ফুল ফুটেছে। আমি নিষ্পলক মীন পিয়াসীর মত দেখলাম। বানের জলের মত পাক খেয়ে মনটা উত্তাল হয়ে উঠলো। প্রজাপতির প্রগতি পরাগের শিহরণে ফুলটা দুলতে থাকে। আর সেই মুহূর্তে রুগ্ন জাম গাছটার একটা ডাল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

অফিস থেকে অনিমেষের ফিরবার সময় হতে আমি সতেজ হয়ে উঠি। জঙ্গলের দেশের এই নির্জন বাংলোতে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি। ওর জন্য বিকেলের জলখাবার টেবিলে যত্ন করে সাজাই। চায়ের জল চাপিয়ে জামাকাপড় এগিয়ে রাখি।

টেবিলের উপর বসে থাকা সাদা বেড়ালটাকে আদর করে কোলে নিলাম। ওর নরম লোমগুলোতে হাত বোলাতে বেশ ভালো লাগে। ও আরাম পেয়ে আমার দিকে সন্তৃপ্ত আওয়াজ তুলে ডেকে ওঠে—ম্যাও। আমি যেন 'মা' ডাকই শুনলাম। ঠোঁট স্পর্শ না করে সশব্দ চুমু খেলাম। বাইরে গেটের কাছ থেকে কুকুরটার ডেকে ওঠার অর্থ আমি সহজেই বুঝতে পারি। অনিমেষকে দরজা খুলে দিতে এগিয়ে যাই।

অনিমেষ আমাকে যারপরনাই বিস্মিত এবং উৎফুল্ল করলো। হাতের খাঁচাটি এগিয়ে দিয়ে বললো,—ময়না। শেখালেই কথা বলবে।
যদিও এককালে আমি পাখি আনতে বলেছিলাম, কিন্তু সে শখ আমার আপাতত নেই। কুকুর বেড়াল আর যাই হোক ওদের দিয়ে কথা বলানো যায় না। তাই বেড়ালের 'ম্যাও' ডাকে আমি অপরিতৃপ্ত 'মা' হয়ে উঠতাম। প্রথমে পুলক, তারপর বিষণ্ণ হয়ে বিলীন হতাম।
চায়ের টেবিলে বসে অনিমেষ ওর বন্ধু উৎপলের কথা বললো। আজকের ডাকে চিঠি পেয়েছে উৎপল রবিবার ভোরে এখানে এসে পেঁছুবে।
বিয়ের পর থেকে উৎপলের গল্প শুনে শুনে আমার মনে ওর একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমি ওকে না দেখেও অনুমানে একান্ত পরিচিত করে নিয়েছি। তবু ওকে দেখবার জন্য উৎসুক হলাম। মনে হলো, রবিবারটা যেন এবার একটু বেশিরকম দেরী করে আসছে।
রবিবার সকাল থেকেই আমার মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। কাজ করতে বেশ ভালো লাগছিল। নিজের খেয়ালেই একটু সেজেছিলাম। আয়নায় পরখ করছিলাম ঘন ঘন। অনিমেষ আদ্দির পাঞ্জাবী আর ব্রেসলেট ধুতি পরে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো। আয়নায় দু'জনের যুগল ছবি দেখে আমি যেন দশ বছর আগে ফিরে গেলাম। অনিমেষ আমার দু'কাঁধে হাত রেখে বললো, ওয়াণ্ডারফুল। সত্যি তুমি কি সুন্দর। আমি ওর মনের ইচ্ছে বুঝতে পারলাম। বললাম, বুঝেছি, কিন্তু না, রান্না সামলাই গিয়ে আগে। আমি রান্নাঘরে পা বাড়ালাম। অনিমেষ ব্যর্থতায় আপসোস করলো হয়তো।
বড় অদ্ভুত লোক এই উৎপল। চঞ্চল উচ্ছল চটপটে। প্রথম দেখাতেই ওকে আমার ভালো লাগলো। চেহারায় নয় ব্যবহারে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে বড় বেশি প্রকাশ করলো যেন। বকছে তো বকছেই। এতও কথা জানে লোকটা। আর আমি নীরব শ্রোতা শুনছি তো শুনছিই! যতই শুনছি ততই যেন ওর অন্ধকার দিকগুলো প্রকট হয়ে উঠছে। ওর দুগালের ব্রন ফাটানো দাগগুলো রাশি রাশি বিবর হয়ে আমাকে বিব্রত করতে থাকে। ওর শ্যাম্পু করা চুল আর রোলগোল্ডের চশমায় চোখ দুটো যেন ক্ষুধার্ত বীভৎস হয়ে উঠছিল। আমার না-দেখা উৎপলের ছবিটা দেখার ক্যানভাসে ক্রমশঃ বিবর্ণ ধোঁয়াশায় ভরে গেল!
সমস্ত দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল তা অনুমানে এলো না। শুধু গল্প-গুজব হাসি ঠাট্টা আর কথার ফুলঝুরি। একটুকু ক্লান্তি নেই বরং যেন একটা নেশার ঘোর।

বিকেলের চাপর্ব সেরে বালির চড়ায় বেড়াতে গেলাম। উৎপল আর আমি কথা বলছি তো বলছিই। ঠিক বলছি বললে ভুল হবে। ও বলছে আমি শুনছি। অনিমেষ কোন সুযোগই পাচ্ছে না। এক সময় ও কোণঠাসা হয়ে নিজের মনে গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। অনেকটা এগিয়ে চলে খুশির আমেজে!

ফুরফুরে হাওয়ায় আমার কাপড় সময় সময় অসভ্যতামি করছিল। বালিতে পা বসে যাওয়ায় আমি চলতে গিয়ে বেসামাল হচ্ছিলাম। সময় বিশেষে উৎপল আমাকে সাহায্য করছিল। সেই সব মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, উৎপল আমার অনেক কালের চেনা। আমাদের বন্ধুত্ব যেন জাহাজের মাস্তুল আর নোঙরে বাঁধা।

এক সময় তিনজনেই ক্লান্ত হলাম। বালির আসনে নির্বিবাদে বসে পড়লাম পাশাপাশি। অনিমেষ গান ধরলো 'জোছনা বিছানো আঙিনায়'। আমি পূর্ণিমার চাঁদ যেন নতুন করে দেখলাম। নিষ্পলক দেখছি! আর ভাবছি। মনে হল, চাঁদ কিন্তু আজো সেই তেমনি আছে। আমাদের মন আর চোখ দুটো শুধু আগের মত বাধ্য নয়। তাই সে বিদ্রোহ করে। বলে, 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' আমি কিন্তু ঝলসানো মনের কালিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলাম না। বরং চাঁদের আলোয় প্রশান্তি পেলাম।

অনিমেষ শুয়ে পড়ে গান ধরলো 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে'। পুরনো দিনে এ গানটা বড় বেশি রকম শোনা যেত। আমি যেন ক্রমশই অতীতে ফিরে চলেছি। সফেন ঢেউ-এর পর ঢেউগুলি সব অবিশ্রাম আছাড় খাচ্ছে, ভাঙছে, তোলপাড় করছে।

নারকেল বনে উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়ার শব্দ অনুরণিত হচ্ছে। আমি সেই মাতন তাণ্ডবতা ও উচ্ছলতায় ভরা উচ্ছ্বাস শুনছি দেখছি এবং অনুভব করছি। আমার যৌবনে কখন দোলা লেগেছিল জানিনা। আমি অদ্ভুত এক মাদকতায় আপ্লুত হলাম। শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে আনমনে বালির উপর পর্যায়ক্রমে হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় থমকে গেলাম। উৎপলের হাতের স্পর্শ পেলাম। ঠিক সেখানেই আমার হাতটা নীরব সম্মতিতে স্তব্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত এক উত্তপ্ত আবেগে সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছিল। নিঃশ্বাসেও তারই একটা সমধর্মিতা বজায় ছিল। সেই মুহূর্তে অসীমের ক্লান্ত মন আমার পাখা ঝাপ্টায় নির্বিচারে আঘাত খেল। আমি একান্ত করে সীমন্ত সীমার আকাঙ্ক্ষায় নিজের তৃষিত ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চাটছিলাম।

অনিমেষ একের পর এক আপন মনের খেয়ালে গান গেয়ে চলেছে। বড় অদ্ভুত

এই মানুষটা। আপন খেয়ালে বেশ আছে। নিঃসন্তান বলে কোন দুঃখ আছে তা বুঝবার উপায় নেই। অথচ আমি জানি ও আমার চেয়েও নিঃসহায় এবং একা হয়ে মাথা কুটে নিঃশব্দে কাঁদে। তবু বুঝতে দেয় না। শুধু বলে, 'জানো স্বাতী, তুমিই আমার জীবনের সব। তুমি থাকলে আমি আর কিছু চাই না।'

যদিও এতটা ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না। তবু আমি মনেপ্রাণে জানি অনিমেষের কথাটা কত নির্মম সত্য। ওর জীবনে আমি এসেছি এক সন্ধিক্ষণে। যখন ও আপনজন বলতে একমাত্র বাবাকে হারালো তখন সান্তবনা দেবার জন্য আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। অনিমেষ জোঁকের মত আঁকড়ে ধরতে চাইল আমাকে। ওর প্রতিশ্রুতি চাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মমতায় জড়িয়ে গেলাম। সেই থেকে আজো জড়িয়ে আছি—ওর সুখে দুঃখে সমান অধিকারে।

কলেজ পালিয়ে প্রায়ই দুপুরে অনিমেষের বাড়ি যেতাম—কেননা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও যতটা উদাসীন ছিল, আমি ততটা উদ্বিগ্ন! ভর দুপুরে গিয়ে দেখতাম নিজের হাতে রান্না করতে গিয়ে চোখের জলে নাকাল হচ্ছে। নয়তো বই পড়ছে এক মনে—রান্নার কথা মনেই নেই। পরে অবশ্য আমার অপেক্ষাতেই থাকতো—কেননা আমার যাওয়াটা একটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কোনদিন না গিয়ে উপায়ও ছিল না। হঠাৎ ছুটে আসতো কলেজে। আমি অপ্রস্তুত হতাম। একটু রাগও হতো। ওর বুঝতে অসুবিধা হতো না। তবু পর্দা-ঢাকা কেবিনের এক কোণে অপরাধীর মত আমার দিকে বিষণ্ণ চোখ দু'টো তুলে ধরে বলতো, 'আমি নয় তুমিই বরং আমাকে একটা চুমু দাও।'

প্রথম প্রথম কথাটা শুনে বেশ বিস্মিত হতাম। ওর ছেলেমানুষীতে কিন্তু কিন্তু করতাম। ও বুঝতে পেরে বলতো, জানো স্বাতী, আদর্শ স্ত্রী কেমন হবে সে সম্পর্কে সংস্কৃতে এক জায়গায় পড়েছিলাম, "স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু রমা, রঙ্গে সঙ্গী।"—তুমি একাধারে আমার মা, স্ত্রী এবং বন্ধু। তাইতো যখন জ্বালা অনুভব করি তোমার কাছে ছুটে আসি একটুকু সান্তবনা পাবার জন্য। অথচ আমি জানি এতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।

একথার পর আমার রাগ বাষ্পীভূত হয়ে যেত। আমি অনিমেষের জ্বালায় জ্বলে যেতাম। বুকের ভিতর ওর মাথাটা টেনে নিয়ে উপবাসী চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বলতাম, 'ভাবছো কেন, চাকরি একটা পাবেই।'

অল্পেই খুশি হয়ে ফিরে যেত অনিমেষ। যাবার আগে একগাদা পরোয়ানা দিতাম—সময় মত খাবে, স্নান করবে ঘুমোবে। বেশি সিগারেট বা চা খাবে না। —আরো কতো কি যে বলতাম তা ঠিক মনে নেই।—সে কি আজকের কথা।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে পারের দিকে জলের গতি ক্রমশই ধেয়ে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ; আর ফিরছে না। এক সময় অনিমেষের পা ছুঁলো। অনিমেষ চমকে উঠলো। নতুন শুরু করা গানটা প্রথম কলিতেই থেমে গেল। উৎপল চকিতে আমার হাত থেকে ওর হাতটা সরিয়ে নিল।

ঘরে ফিরে যখন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম তখন আমাকে একরাশ অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছিল। আমি ক্রমশ অন্ধকারের গভীরে ডুবে যেতে থাকলাম। আমার মধ্যকার মাতৃহীনার অপরিপূর্ণ নারীসত্তা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠলো। একটা বিদ্রোহের বান শিরায় শিরায় বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে গেল। ডাঃ ঘোষের কথাগুলো আমার কানে বারবার জ্বালা হয়ে বাজতে থাকলো, 'স্যরি মিসেস চৌধুরী। ইউ আর কোয়াইট ফিট, কিন্তু মিস্টার চৌধুরী—।'

কথাটা আজো জানেনা অনিমেষ। ও জানে আমরা দু'জনেই সক্ষম। আমিই জানাইনি ডাঃ ঘোষের পরামর্শে। খবরটা শুনে ওর হয়তো মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এমন কি সাময়িক উত্তেজনায় ওর পক্ষে আত্মহত্যাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি যেন আর পারছি না। মা হবার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাই আমাকে উঠতে বসতে বিদ্রূপ করে। সত্যিকার নারী জীবন সম্পর্কে হাজারো প্রশ্নে আমাকে বিব্রত ও বিচলিত করে। আমি কোন সঠিক জবাব খুঁজে পাই না। ইংরেজি সেই কথাটাকেই জ্বলন্ত সত্যি মনে করি, ওম্যান ইজ ওম্যান। সী এণ্ডস্ ইন এ মাদার। আজকাল তাই নারীত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যগুলো পড়তে ভালোবাসি। মনে মনে ধর্ষিতা হয়েও মা হওয়াকে শ্রেয় মনে করি।

সেদিন রাস্তার ধারে বড় গাছটার পাতা ঝরা দেখে আমি জানতাম গাছটায় আবার নতুন করে পাতা গজাবে, ফুল ফুটবে। পাখির আড্ডা বসবে। এ শুধু ঋতুবদল মাত্র।

একরাশ ভাবনার মশাগুলো আমাকে ছেয়ে ফেলে। মনে মনে ভাবি, জীবনেরও তো ঋতু বদল হয় অথচ আমিতো শুধুই ঝরে চলেছি। যেন বেলা শেষ না হতে বেলা গেল। ঝরা পাতা, সাঁঝের খেয়া আর ঘরেফেরা পাখিগুলো আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি পাশে অনিমেষের জ্বরো গা-য়ের উত্তাপ পাচ্ছি ; সর্দি বসে গিয়ে ওর নাক দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ বের

হচ্ছে। অনেকটা বাচ্চা ছেলের গোঙানির মত।

পাশের ঘরে উৎপল হয়তো ঘুমোচ্ছে! কাল ভোরের বাসেই ফিরে যাবে উৎপল। 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—অনিমেষ এককালে প্রায়ই বলতো লাইনটা। হয়তো এমনিই। কিন্তু আজ যেন দশ বছরের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে ছাপিয়ে ওই লাইনটা আমার কানের কাছে পেণ্ডুলাম হয়ে দুলতে থাকে।

জানলার সামনে মাধবীলতা গাছটায় দুলন্ত ছায়া আমার মনের মধ্যে স্পন্দন এনে দিল। উৎপল সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত। ওর চোখের ভাষা আমার বুঝতে ভুল হয়নি বলেই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে ভর করে নারী জীবনের পরমের প্রত্যাশায় আমি যেন খাট ছেড়ে উৎপলের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তার আবছা আলো এসে পড়েছে টেবিলের উপর। এ্যালবামে বিয়ের আগে তোলা আমার ফটোটা দেখে কেন যেন চমকে উঠলাম। ফটোটা অনিমেষকে প্রেজেন্ট করতে চেয়েছিলাম। ও ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, ফটো নয় তোমাকেই আমার চাই—তুমি ছাড়া আমি যেন এক পা-ও চলতে অক্ষম। আমি স্মিত হাসি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, একটু স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করো, আমিতো চিরকাল নাও থাকতে পারি।

ডাঃ ঘোষের রিপোর্টের পর থেকে আমি একাধিক বার ওর জীবন থেকে সরে যাবার চিন্তা করেছি। প্রতিবারই একটা প্রশ্ন কাঁটা হয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে —ওকি সত্যিই স্বাবলম্বী হয়েছে!

হঠাৎ আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। একরাশ আলোয় ভরা বিছানায় আমি স্পষ্ট দেখলাম, জ্বর গায়ে ক্লান্ত অনিমেষ ছোট ছেলের মতো পা দু'টো ভাঁজ করে আমার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। আমি নতুন করে জড়িয়ে গেলাম! আমার স্বামীই যেন সেই মুহূর্তে আমার সন্তান হয়ে সব স্নেহ কেড়ে নিল। অদৃশ্য কোন এক কেন্দ্রবিন্দু থেকে বার বার শুনতে পেলাম, জানো স্বাতী, তুমিই আমার মা স্ত্রী এবং বন্ধু।

দুলেন্দ্রর দুই দরজা

বাস থেকে নেমে দুলেন্দ্রর খেয়াল হল, আজ নির্ধারিত লোড-শেডিং-এর দিন। সে আজ অপ্রত্যাশিতভাবে বাসে বসার সীট পেয়েছিল। বসতে পারলেই আলস্যে তার ঝিমুনি আসে। সেহেতু এতক্ষণ বাসে বসে ঝিমোচ্ছিল। সুতরাং চারদিকের গাঢ় অন্ধকারটা মালুম হয়নি। এখন হল।
সে মুদীদোকান থেকে মুড়ি নিল। সঙ্গে একটা দাঁতের মাজন আর কাপড়-কাচা সাবান। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় টাকা-পয়সা গুনে খুচরো কিছু কমতি দেখতে পেল। কিন্তু নতুন করে আরেকটা টাকা ভাঙাতে ইচ্ছে হল না। ফলত ঠোঙাটা ফিরিয়ে দিয়ে ঘাটতি পয়সা পরিমাণ কম মুড়ি দিতে বলল।
শেষ বর্ষায় পাড়ার রাস্তায় এখনো জমে থাকা ইতস্তত জল কাদা। তদুপরি ছোট গর্ত এবং জমাট অন্ধকার। সে কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। তেমন জুতসই আলো হল না। অর্থাৎ ব্যাটারী বাড়ন্ত। মাসের শেষে এখন নতুন ব্যাটারী কেনার কথা ভাবনার বাইরে। সুতরাং আপাতত ব্যাটারী—ফুরন্ত টর্চের ম্লান আলোতে প্রখর দৃষ্টি ছড়িয়ে রাস্তার দূরত্ব কমাতে থাকল।
বাসায় ফিরে জ্বলন্ত টর্চ বগলবন্দী করে তালা খুলল এবং সেদিনকার কিনে আনা মোমের শেষাংশটুকু খুঁজে বের করল। জ্বালাল। ভাবল, একটা মোম কিনে এনে রাখা একান্ত দরকার। কিন্তু শরীর জুড়ে সমস্ত দিনের ঘাম জবজবে গেঞ্জী জামা; ক্লান্তি এবং অবসাদ। রাস্তার যা হাল; সেই সঙ্গে টর্চের ব্যাটারী ফুরন্ত। এসব কারণে আবার রাস্তায় বেরিয়ে মোম কিনে আনতে ইচ্ছে হল না।
সে একে একে জামাকাপড়গুলো খুলল। একমাত্র আণ্ডারওয়ার পরে কুয়োতলায় গিয়ে আওয়াজ তুলে জল কুলকুচো করল। হাতমুখ ধুয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর বাথরুম থেকে ফিরে গামছায় জল মুছে তবে কিছুটা আরামবোধ করল। কিন্তু পরক্ষণেই ঘরময় অসহ্য গুমোট গরম লাগতে খেয়াল হল, বন্ধ জানলাগুলো খোলা হয়নি। একে একে জানলার

কপাটগুলো খুলে দিতে নর্দমার পাশ থেকে মিনি নামে পোষা বেড়ালটা মিউ-মিউ আওয়াজ তুলল। একলাফে জানলা টপকে ঘরে ঢুকলো। তারপর কাছে এসে তার বেআব্রু পা দু'টোয় লোমশ গা ঘষে ঘষে ঘুরতে থাকল। সেই সঙ্গে মুখে মিউ মিউ শব্দ।

মিনির এসব পরিচিত আওয়াজ আচরণের প্রকৃত অর্থ সে জানে। সেইমতে তার খেয়াল হল, অনেক সকালে সে আজ আউটডোর হাসপাতালে বেরিয়েছে। ওখান থেকে সোজা অফিস। ফিরছে এই রাত্তিরে। সুতরাং আজ সমস্ত দিন নির্ঘাৎ মিনির কিছু খাওয়া হয়নি। মিনি এখনই কিছু খেতে চাইছে। এই এক আশ্চর্য জীব। একবার পোষ মেনে গেলে না-খেয়ে ভুখা থাকবে তবু ঘর ছেড়ে অন্যত্র খাবার জোগাড়ে যাবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে ঠোঙা থেকে মুঠোয় ভরে কিছুটা মুড়ি মেঝেয় ছড়িয়ে দিতে মিনি জিবের ডগায় মৃদু শব্দ তুলে খেতে থাকল। ঠোঙার বাকি মুড়ি-গুলো সে একটা এনামেলের বাটিতে ঢেলে নিল। দেওয়ালের তাকে একটা কলা ছিল। একটু চিনি দরকার; অথচ চিনির কৌটো শূন্য। তবে কী করা যায়! অনেকদিন আগে গ্রাম থেকে মিনুমাসী লোক-হাতে কিছু নারকেলের নাড়ু পাঠিয়েছিলেন। পাশের ভাড়াটে ঘরের রন্তু নামে ছোট্ট ছেলেটা একদিন তার ছুটে আসা খেলার বল কুড়োতে এসেছিল। ভারী মিষ্টি চেহারা ছেলেটার। চোখ দুটো নীলাভ সমুদ্রের মত উজ্জ্বল এবং নির্মল। সে আদর করে রন্তুকে কয়েকটা নাড়ু দিয়েছিল। সেই থেকে খেলার ছলে ছেলেটা রোজ সকালে আসত। সে তাকে আদর করত। গল্প করত। হাজারো বেখাপ্পা প্রশ্নের জবাব দিত; এবং তার হাতে নাড়ু দিত। কৌটোটার দিকে তাকিয়ে রন্তু জিগ্যেস করত, এখনো দিচ্ছো না কেন?

—কী?

—নাড়ু। তাকে কাজে ব্যস্ত দেখলে রন্তু অনুমতি চাইত, আমি হাত দিয়ে নোব?

—নাও। তবে বেশি না কিন্তু।

আজ এই মুহূর্তে নাড়ুর কথা মনে পড়তে সে কৌটোটা ঝাঁকালো। কোন আওয়াজ না হাওয়ায় খেয়াল হল, রন্তু কয়েকদিন হল আর আসে না।

মিনি তার খাওয়া শেষ করে মসৃণ মেঝে চাটতে চাটতে একসময় ঊর্ধ্বমুখে জ্বল জ্বল চোখ চেয়ে তাকাল। দারুণ জ্বলন্ত দু'টো চোখ। মোমের ম্লান আলোয় ভয়ঙ্কর দেখতে। সে আবার কিছুটা মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে নিজেও খেতে থাকল। শুকনো মুড়ি। সঙ্গে নবাবের হাতে ফুটন্ত গোলাপের মত খোসা

ছাড়ানো বৃন্তে আঁটা কলা। কুটুস কুটুস কামড়ে ছোট্ট টুকরোগুলো জিবে টেনে নেয়া—কী ভীষণ কৃপণতা। তবু কলাটা শেষ পর্যন্ত মুড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমতালে ছুটতে পারে না। অনেক আগেই ফুরিয়ে গেল। মিনি আবার মেঝে চাটতে চাটতে ঊর্ধ্বমুখে চোখ তুলে তাকাল। সে তাই বাকি মুড়িগুলো মিনিকে মেঝেয় ছড়িয়ে দিল।

কুজোর জলটায় কেমন যেন দুর্গন্ধ। তার খেয়াল হল, আজ সকালে প্রতিদিনকার মত খাবার জল তোলা হয়নি। একে বাসি জল তায় আবার তলানিটুকু। সুতরাং দুর্গন্ধ স্বাভাবিক। তবু ঢকঢক জল খেল। তৃপ্তির আওয়াজ তুললো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে ডাক্তারের নির্দেশ মনে পড়ল—চা সিগারেট খাবেন না। তেল ঝাল মশলা খুব কম। রোগটা লিভারের। সুতরাং সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাবার খাবেন। সেই সঙ্গে বিশ্রাম একান্ত দরকার। সে সিগারেট খেল না। সিগারেটটা আঙুলের চাপে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এখনো তক্তোপোষের ওপর পাশাপাশি সাজানো দু'প্রস্থ মাথার বালিশ। দু'টো পাশ বালিশ। অথচ, মানুষ বলতে সে একা। এমনিতেই ছোট্ট ঘর। যেটুকু সামান্য আসবাবপত্র আছে তাতে ঘরটা আরো বেশি রকম ছোট মনে হয়। তবু মনে হল, এতবড় ঘরে সে আজ নিঃসঙ্গ একা।

শোবার জোগাড়ে সে কাঁধের গামছা দিয়ে অগোছালো বিছানা ঝেড়ে দু'হাতের তালুতে ফেলে বালিশগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললো ; এবং আয়েস করে গা এলিয়ে দিল। যা ! মোমটা শেষ। চোখ ফিরিয়ে দেখল, কৌটোর ঢাকনায় গড়ানো তরল মোমে ডুবন্ত শেষ সলতেটুকু পটপট শব্দ তুলে জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিভে গেল।

অতএব ঘরময় গাঢ় জমাট অন্ধকার। গুমোট গরম। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। বিছানাটা বোধহয় ঠিকমত ঝাড়া হয়নি। কিংবা দীর্ঘদিনের অপরিচ্ছন্নতার জন্য সমস্ত শরীরময় কুটকুট চুলকাচ্ছে। মিনিটা গেল কোথায় ? ওর কোন সাড়া শব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে।

ঘরের কোন কিছুই আর নজরে আসছে না। এমনকি নিজেকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত আদুর গায় হাত বোলাতে বোলাতে খেয়াল হল, এখন শরীরে বস্ত্র বলতে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়ারটা। সেটাও দেখা যায় না। এটাকেও অনায়াসে খুলে ফেলা যেতে পারে। কেই বা আর দেখছে। এমনকি নিজেও কিছু দেখতে পারবে না। সুতরাং সে নগ্ন হয়ে গেল।

এরকম আচরণ তার জীবনে এই প্রথম। এটাকে কী বলা চলে—মনোবিকার ?

সে কোন উত্তর খুঁজে পেল না। খুব একটা মাথা ঘামালো না। বরং এভাবে অন্ধকারে নগ্ন হয়ে বেশ ভাল লাগল। ভীষণ হালকা এবং পবিত্র পবিত্র মনে হল। জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত বহুবিধ তত্ত্বকথা মনে এসে গেল। জাগতিক কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে সে এক আনন্দময় শুচিসুন্দর শূন্যলোকে বিচরণ করতে থাকল। এক সময় বিক্ষিপ্ত ভাবনা চিন্তার গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে স্ত্রী চৈতি-স্মৃতি ভেসে এলো। মনের ভিতর এক ধরনের তীক্ষ্ন চঞ্চলতা অনুভব করল। চৈতি-সম্পর্কিত টুকরো টুকরো স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ক্লান্ত বিষণ্ণ এবং নিঃসঙ্গ বোধ করল।

তার জীবনে নিঃসঙ্গতা নতুন কিছু নয়। কৈশোরে পিতৃহীন। দারিদ্র্যজনিত কারণে গ্রাম গৃহ মাকে ছেড়ে কোন এক হিতৈষীর ঘরে মানুষ হওয়া। যৌবনে টিউশানি করে কলেজে পড়া। তারপর মেসে থেকে চাকরি। বাসা ভাড়া করে মাকে আনা। একটু বেশি সময়েই চৈতিকে বিয়ে করা। মোটামুটি একটা স্বল্প সুখের জীবন। চৈতি ঘরের বাইরে দু'দণ্ড পা ফেলত না। কস্মিন্‌-কালেও কোথাও একা বেড়াতে যেত না। সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকত। সেজন্য কখনো-সখনো তার মনে হত ব্যাপারটা কেমন যেন স্বামীকে পাহারা দেয়ার মত। বুঝি বা কেমন অবিশ্বাসও—এমনতর ভাবনা মাঝেমধ্যে মনে উঁকি দিলেও সমস্ত ব্যাপারটা চৈতির গভীর প্রেম মনে করে সে তেমন আমল দেয়নি। যাক্‌, মা মারা যাবার দু'মাস না যেতেই যখন অফিসে লাগাতার ধর্মঘট চলছিল তখন তার নিত্যদিনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চৈতিও চলে গেল।

চলে যাওয়া অর্থে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া। চৈতি কোথায় কার সঙ্গে গোপন ঘর করছে তা সে জানে। জেনেশুনেও নির্বিকার। কেননা, স্ত্রী পালিয়ে যাওয়া যে কোন পুরুষের পক্ষেই অন্তহীন লজ্জা। তাছাড়া, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তার বিশ্বাস, চৈতি আসবে। নিশ্চিত হঠাৎ কোন একদিন ফিরে আসবে। নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। ক্ষমা প্রার্থনার লজ্জা-ম্লান মুখটা তার বুকের ভাঁজে লুকাবে। সে চৈতির চুলে ঠোঁট ছোঁয়াবে। আঙুলের আঁচড় কাটবে। চৈতি তার বুকের লোমে নাকের ডগা ঘষবে; আলতো হাত বোলাবে। কিছু মান অভিমান ভালবাসার খেলা চলবে। আর তারপর যথারীতি আগেকার মত ঠিকঠাক জীবন।

প্রতি পদক্ষেপে তার কত যে কষ্ট তার নাড়িনক্ষত্র চৈতির নখদর্পণে। অথচ, সে কিছুতেই ভেবে কূলকিনারা পায় না—চৈতি কেন যে তার টাকা-পয়সার অভাব নিয়ে বড় বেশি বিরক্ত করত। সে প্রায়শই বলত, তুমি কেন যে বোঝ না, দিতে পারাতেই যত আনন্দসুখ। দিয়ে সে আনন্দসুখ কেইবা আর পেতে না

চায়। আজন্ম সংগ্রামী জীবনে আমার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। হাসিমুখে থাকার অর্থ সুখ নয়। সুখ আর শান্তি ভিন্নতর। আমি শান্তি প্রত্যাশী। জানি, তোমার জীবনেও অনেক কষ্ট। আমারও। দু'জনের কষ্ট মিলে এক বিন্দু শান্তির জন্য এসো না দু'জনে চেষ্টা চালিয়ে যাই।

চৈতি কোন জবাব দিত না। একরাশ ভারী মেঘ-মুখ নিয়ে নিশ্চুপ থাকত সে। সে আরো অনেক অনেক প্রশ্ন করত। চৈতির কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় থেকে থেকে ব্যর্থ হত। একসময় নৈরাশ্যে ডুবে গিয়ে অবিরাম যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকত।

চৈতি চলে যাবার পর প্রথম দিকে সে প্রায়শই ভাবত, চৈতি নিশ্চিত অফিসে ফোন করবে। পাশের টেবিলে বড়বাবুর সামনে তার জন্য কোনদিন ফোন বেজে উঠলেই উৎকণ্ঠিত কান পেতে মনে করত, বোধহয় চৈতির ফোন এল। সে যে কি জমজমাট উত্তেজনা। শরীর মন জুড়ে শিহরণ। অথচ, এখনো বুকের কোণে গোপন কাঁটা ক্ষোভ যন্ত্রণা—ওপার থেকে চৈতির কণ্ঠস্বর একদিনও ভেসে এল না।

কিছুকাল আগেও সে চৈতির চিঠির প্রত্যাশা করত। ভাবত, হয়ত চৈতি তাকে চিঠি দেবে। সে চিঠিতে কয়েক দফা শর্তসাপেক্ষ সন্ধি তথা আপস মীমাংসার প্রস্তাব থাকবে। সে স্থির মনে সিদ্ধান্তে এসেছিল, তেমন কোন প্রস্তাব এলে জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসানের অংকে না গিয়ে এক কথায় সে সন্ধি মেনে নেবে। অথচ, এখনো বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়—চৈতির কোন চিঠিই এল না।

আজকাল তার ঘরময় চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতা। জিনিসপত্তর অগোছালো। কার্নিশে ঝুল। মেঝেয় ধুলো। ছাইদানীতে পুঞ্জীভূত সিগারেটের টুকরো আর ছাই। মেঝেয় কুজো উপচে পড়া জলের দাগ। বিছানা মশারীতে কেমন যেন তেল চিটচিটে দুর্গন্ধ। এখনো চৈতির আটপৌরে কাপড় আলনায় ঝুলছে। দেয়ালের তাকে আয়নার সামনে খোঁপার বল। ভুলে ফেলে যাওয়া চৈতির হাত ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। চুলের কাঁটা ফিতে সেফ্‌টিপিন এবং ব্লাউজের হুক। সিঁদুর-কৌটো এবং কিছু অনাড়ম্বর প্রসাধন দ্রব্য। বিয়ের পর স্টুডিওতে তোলা যুগল ছবি—সবই আছে ; কিন্তু চৈতি না থাকায় কোন কিছুই ঠিকঠাক নেই। মাঝে অবশ্য দিনকয়েকের জন্য এই ঘরের চেহারাটা পাল্টে গিয়েছিল।

সেই যখন তার বসন্ত হয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ল। লোকমুখে খবর পেয়েও চৈতি আসেনি। বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায় তার মুখে অন্নপথ্য তুলে দেবার মত কেউ ছিল না। তখন বিনা আহ্বানেই রন্তুর মা মমতা

অপ্রত্যাশিতের চমক লাগিয়ে তার ঘরে এসেছিল।
মমতা প্রতিদিন তার ঘরে আসত। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঠিকমত ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখত। মুখে অন্নপথ্য দিত। এমনকি তার শিয়রের কাছে বসে সে বসন্তগুটিতে চন্দনের প্রলেপ লাগাত। চুলের অরণ্যে হাত বোলাত। তার হাতের আঙুলগুলো নিজ মুঠিতে নিয়ে খেলা করত।
সেইসব বিশেষ মুহূর্তে মমতার উত্তপ্ত ভালবাসার পরশ পেতে পেতে সে আত্ম-সুখের পরম প্রশান্তিতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। যদিচ, মমতার উপস্থিতি ভাল লাগত। তার সমস্ত নিঃসঙ্গতা বিষাদ ভুলে যেত। প্রাণমন জুড়ে আশ্চর্যময় পরিপূর্ণতা ও রক্তচাঞ্চল্য অনুভব করত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হত, মমতা পরস্ত্রীমাত্র। মমতার সিঁথি এবং কপালের উজ্জ্বল সিঁদুরে স্থির দৃষ্টি ফেলে দ্বিধা সঙ্কোচে কুঁকড়ে গিয়ে সে একদিন প্রশ্ন করেছিল, আমার জন্য অহেতুক কষ্ট করছেন কেন ? মমতা প্রত্যুত্তরে বলেছিল, আপনার কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয় বলে। উত্তরটা শুনে সে নির্বাক চোখ চেয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিল। কোন কথাই আর বলতে পারেনি।
সে নতুন করে আর কোনদিন অমনতর বোকার মত প্রশ্ন করেনি। কারণ পরিবর্তিত সময়ের ব্যবধানে সে নিজেও বুঝতে পারছিল, ভালবাসা বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দুজনে ক্রমশ কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। প্রিয় আপনজন হয়ে উঠছে।
মানসিক অনেক দ্বন্দ্বদোলার পর সে একদিন মমতাকে বলেছিল—স্বামী, সংসার, সন্তান—আপনার ভূমি, বায়ু, আকাশ। এই তিনের উপর ভিত্তি করে আপনি বেঁচে আছেন। বাঁচতেও হবে। সুতরাং, এখানে এসে নিজের সংসারে অশান্তি না বাড়ানোই ভাল।
মমতা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন করেছিল, আমার সাংসারিক প্রয়োজনের আলো জ্বালিয়ে বাড়তিটুকু যদি এখানে জেবলে দেই তাতেও আপত্তি ?
এত সুন্দর অর্থবহ কাব্যিক একটা সংলাপ মমতার মুখ থেকে শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ কোন উত্তরই খুঁজে পায়নি। পরে অবশ্য নির্মম সোজা উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ। আমরা দুজনেই বিবাহিত। সুতরাং আপনার না আসাই ভাল।
তারপরও মমতা এসেছিল। সে পূর্ণ সুস্থ হতে এখন আর আসে না। এখন প্রতিদিন সকালে সে যখন রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন মেঝেয় নিকোন দেয়, উঠোনে কুয়োতলায় বাসন মাজে—মমতা তখন বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

সে স্পষ্টত বুঝতে পারে, তার সামান্য আহ্বানেই মমতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব কাজ গুছিয়ে দিতে রাজী। আর তা হাসিমুখেই। চাই কি তার মুখের কাছে খাবার থালাটাও তুলে ধরতে পারে। সেই আশাতে কারণে অকারণে হামেশা তার ঘরের পিছন দরজায় ঘুরে যায়। অথচ, করাঘাত করে সাড়া জাগাতে সাহস পায় না।

তার কেবলই মনে হয়, চৈতি কেন যে বুঝলো না—তার জন্য একজন প্রতীক্ষা প্রত্যাশার আপনজন বেঁচে আছে। সে যে তাকে কি গভীর ভালবাসে। সে চৈতি-স্মৃতি নিয়ে অবসর সময় কাটায়। চৈতি-ভাবনায় উদাসী হয়ে যায়। সে যে সেই ছোটবেলা থেকেই একটুকু ভালবাসার জন্য নিরন্তর নিস্তব্ধ কাঁদে। তার বুকের ভিতর গোপন কষ্ট বিন্দু বিন্দু ঝরে। বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে আজকাল তার প্রায়শই মনে হয়, ভালোবাসার জন্য তার কাঙালিপনা বোধ হয় চিরকালের ললাট লিখন।

ইদানীং লিভারজনিত অসুখে তার অনেক কষ্ট। খাওয়ায় অরুচি গা বমি বমি ভাব। নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। ভীষণ ক্লান্ত ও দুর্বল লাগে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ জ্বর হয়। প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় ডাক্তারের হরেকরকম নির্দেশ। এমন পরিস্থিতিতে মমতার সাহায্য পেলে ভালই হয়। তবু, বিবাহিত স্ত্রী বেঁচে থাকতে হাত পেতে অন্য কারও সাহায্য নিতে কোথায় যেন বাধে। মনের গভীরে তিরতির প্রবাহ গোপন যন্ত্রণা হয়। সেজন্য অনেক চেষ্টায় মমতাকে এড়িয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ অহং নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে সচেষ্ট থাকে।

ক্রমশঃ রাত নিস্তব্ধ হয়। কি যেন একটা রাতজাগা পাখি মাঝেমধ্যে বিদঘুটে আওয়াজ তুলে ডেকে উঠছে। দূরে কাদের বাড়িতে রেকর্ড-প্লেয়ারে বাছাই করা রবীন্দ্র সংগীত বাজছে। হৃদয়-ছোঁয়া শব্দ সুর ভেসে আসছে। সে আত্মমগ্ন উদাস দৃষ্টি মেলে সামনের জানলায় চোখ রাখল। দেখল, বাইরে আলো জ্বলছে ; অর্থাৎ বিদ্যুৎ এসেছে। তবু ইচ্ছে করেই সে তার নিজের ঘরের আলো জ্বালাল না। অন্ধকারে অনুমানে শিয়রের কাছ থেকে লুঙ্গিটা হাতড়ে নিয়ে পরল। তারপর সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

তার এই টেবিলের সোজা মমতার ঘরে একটা জানলা দেখা যায়। জানলাটা হামেশা খোলা থাকে। পর্দাটা গোটানো। সে একাধিক দিন অনেক রাত পর্যন্ত ওই জানলার শিক ধরে স্বামীর প্রতীক্ষায় মমতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওর স্বামী অনেক সকালে দূরে কোন কারখানায় কাজে যায়। গভীর রাতে নেশা করে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে। অশ্রাব্য খিস্তি খেউড় চিৎকারে তোলপাড়

করে। মমতাকে মারধর করে। কখনওবা তার আগে কিংবা পরে বারান্দায় উবু হয়ে বমি করে দেয়, এবং নিস্তেজ হয়ে যায়।

সে হঠাৎ মনের ভিতর চাপা উত্তেজনা ও অস্থির চাঞ্চল্য অনুভব করল। উঠে দাঁড়িয়ে অশান্ত পায়চারী করতে করতে পিছন জানলায় দৃষ্টি ছুটিয়ে দিল। দেখল, মমতা সেই পরিচিত বিশেষ জানলার শিক ধরে এদিকেই তাকিয়ে আছে। দূর থেকে তার চোখ মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং ভাবান্তর বোঝা মুশকিল। তবু, অনুমান করে অস্বস্তি বোধ করল। মমতার জন্য দুঃখ হল।

এই মুহূর্তে মমতাকে পরস্ত্রী এবং এক্তিয়ার অধিকারের বাইরে জেনেও তার মন অবুঝ অশান্ত হয়ে উঠল। একগলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গীত আলো আনন্দময় জীবনের প্রার্থনায় ভাবল, মমতা এখন কাছে এলে কেমন হয়? প্রশ্নটা মনের ভিতর ঘুরে ফিরে অবিরাম তোলপাড় করল। রক্তপ্রবাহ দুর্বার গতিময় হল। অথচ, সে কিছুতেই কোন জুতসই উত্তর খুঁজে পেল না।

তার বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ভয়ঙ্কর ভারী। স্নায়ু চঞ্চল। মনে হারজিৎ-এর পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বদোলা। সে মমতার মুখোমুখি জানলার শিক ধরে দাঁড়াল। কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ক্লান্তি বোধ করল। বুক বগল এবং কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপ যাচাই করল। জ্বর হয়েছে কিনা বুঝতে পারল না। তবু, স্থির সিদ্ধান্তে এল, তার ভিতরে এখন ভীষণ অসুখ। সুতরাং সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শোবার আগে পিছন দরজার অর্গল খুলে রাখতে গিয়ে অনেক চেষ্টাতেও পারল না। কেমন দ্বিধা সংকোচ এবং অহেতুক মনে হল।

সে অনেক চেষ্টা চালিয়েও গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। ঘুম না-আসা পর্যন্ত ঘরের ভিতরকার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার আর হিমশীতল নীরবতার বুক চেরা দেয়াল-ঘড়ির শব্দ শুনতে থাকল। বুকের গভীরে হৃদস্পন্দনের সঙ্গে সেই শব্দের সামঞ্জস্য খুঁজতে খুঁজতে একসময় খেয়াল হল সামনের দরজায় চৈতির জন্য নিশ্চিত বিশ্বাসে কান পেতে থাকা অভ্যাসটা কখন যেন পিছন দরজায় মমতার জন্য প্রতীক্ষা হয়ে গেছে।

বিকেলের পাখি

চিত্রা আয়নার সামনে বসে সযত্নে চুলে চিরুনি টানছিল। প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে এ পর্যন্ত সে পাঁচটা পাকা চুল তুলতে পেরেছে। আরো আছে কিনা পরখ করতে করতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। একসময় হাতের চিরুনিটা থেমে গেল। চিরুনি চুল এড়িয়ে দৃষ্টিটা আয়নায় প্রতিফলিত মুখের ওপর থমকে দাঁড়াল। আত্মমগ্ন গভীর ডুবে নিজের বর্তমান বয়সের হিসেব কষল। কত বয়স হবে এখন ? তা প্রায় আটত্রিশ তো হবেই। সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে। ভাবতে অবাক লাগল।

চিত্রা এককালে সবে মিলে স্বল্প সুন্দরী ছিল। কলেজ জীবনে রজত অনিমেষ প্রবীর পিনাকেশ আরো কতজনেই না তার প্রেমে পড়বার চেষ্টা করেছে। আদৌ পাত্তা পায়নি। ওর বন্ধু বলতে সেসময় অধিকাংশই ছিল ছেলেরা। সে সবার সঙ্গেই দিল-খোলা আন্তরিকতায় মেলামেশা করেছে। সিনেমা রেস্তোরাঁ কফি হাউস পিকনিক করে বেরিয়েছে। কিন্তু প্রেম বলতে যা বোঝায় তা কারও সঙ্গেই হয়ে ওঠেনি। ওসবের জন্য যে আত্মমগ্ন গভীরতা এবং স্থিতি দরকার হয়, আদপেই তখন তা ছিল না। ওসব নিয়ে দুর্বলতা কিংবা কোনপ্রকার চিন্তা ভাবনা কস্মিন্‌কালেও মনে আসেনি। ফলত সে-সময়কার বন্ধুরা উত্তরকালে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ শূন্য হয়ে অনেক মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেছে।

তারপর চাকরি জীবন শুরু। যতদূর মনে হয় আধা-বিলিতি বর্তমান সওদাগরী অফিসের এই চাকরিটা জুটেছিল চেহারার জোরেই। যদিচ সেসময় সে নিজেও কেরানী কুলে কেন্দ্রীভূত ছিল কিন্তু মেলামেশা বলতে যা কিছু তা ওপরতলার সাহেবদের সঙ্গেই ছিল বেশি। একগুচ্ছ অহং-এর কাঁটা-লতা দিয়ে সে সর্বক্ষণ নিজেকে ভিন্নতর করে রাখার চেষ্টা করত। স্বভাবতই নীচুতলার কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহসই পেত না।

চাকরি জীবনের প্রথম বেশ কয়েক বছর যৌবন উচ্ছল চিত্রাকে বিচিত্র সাজপোশাকে নতুন নতুন সাথীর সঙ্গে দেখা যেত। কখনো স্কুটার কার কখনো বা ট্যাক্সিতে।

ছোটখাট রেস্তোরাঁয় যেতই না। বড় হোটেল বার ক্যাবারে এবং সর্বোচ্চ হারের টিকিটে সিনেমায় যেত। নিজের একটা কানাকড়িও খরচ হত না। ওপরতলার সাহেব আর অভিজাত ঘরের বন্ধুরাই সব খরচ জোগাত। ওদের দৌলতেই সে বেশ কয়েকবার ক্রিকেট টেস্ট দেখেছে। বড় বড় ফাংশানে গেস্টকার্ডে বসেছে। ছুটিতে কাশ্মীর সিমলা দিল্লী দার্জিলিঙ্ পর্যন্ত ট্যুর করতে পেরেছে।
এসব সুখস্মৃতি এখন দুঃখ দেয়। চিত্রা বুক-উজাড় করা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ভাবল, সেই সময়টাতে ইচ্ছে করলেই সে অনায়াসে দেখে শুনে একটা ভাল বিয়ে করতে পারত। অথচ কেন জানিনা বিয়ের কথা আদপেই মনে আসেনি। মনে হয়েছে, বিয়ে মানেই তো বন্ধন। একটা প্রচলিত প্রথা মেনে চলা। সংসার সন্তান এবং স্বামীতে সীমাবদ্ধ থেকে অল্পেতেই ফুরিয়ে যাওয়া। তার চেয়ে সবকিছুই ভোগ উপভোগ করা ভাল—কিন্তু কোন বন্ধন নয়। করেছেও তাই। নিজের জীবন যৌবন এবং দেহের প্রতিটি তৃষ্ণার্ত কোণকে দু'হাত বাড়িয়ে ভরে নেবার চেষ্টা করেছে। নিতে নিতে একসময় নিতান্ত একঘেয়েমিতে জড়িয়ে গেছে। বৈচিত্র্য বলতে যা-কিছু সব হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতা সামান্য কিছুকাল আগে থেকে।
চিত্রা ইদানীং নিজেই বুঝতে পারছিল যে সে ক্রমশই ক্লান্ত স্তিমিত হয়ে আসছে। ঠিক ডানা-ভারী পাখিদের মত। আগেকার মত সে আর চাঞ্চল্য উচ্ছলতা খুঁজে পাচ্ছিল না। আজকাল মনের ভিতর একরাশ নৈরাশ্য বিতৃষ্ণা নিয়ত ঘুরপাক খায়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিব্রত করে। বেশি কথা বলতে ভাল লাগে না। মেজাজটা সর্বক্ষণ তিক্ত হয়ে থাকে।
অনেকদিন পর এই প্রথম চিত্রা স্পষ্ট করে নিজেকে খুঁতিয়ে দেখতে থাকল। সমস্ত দেহের ওপর বয়সের ছাপ পড়েছে। মুখের ত্বকে বিন্দুমাত্র লাবণ্য নেই। অনেকটা, রঙ ওঠা পুরনো কাপড়ের মত ফ্যাকাসে। চোখের মণি দু'টো স্তিমিত ঘোলাটে। নীচে স্বচ্ছ কালো ছোপ পড়েছে। ঠোঁটের পাতা দু'টো বাসি ফুলের শিথিল পাপড়ির মত দেখাচ্ছে। শরীরে আগের মত ঠিক তেমনটি আঁটসাঁট বাঁধন নেই। ইদানীং ট্রেন ট্রাম বাস চড়ার পরিশ্রমে চোখ মুখ দেহ জুড়ে চুড়ান্ত ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে।
চিত্রার কেমন যেন সন্দেহ হল, ওরা যদি আজ দেখতে এসে অপছন্দ করে? লজ্জার অন্ত থাকবে না। ভাবতে গিয়ে বেশ কিছুটা বিমর্ষ সঙ্কুচিত হল। পরক্ষণেই ভেবে সান্ত্বনা পেল, এখনো যা আছে তাতে নজর ফিরিয়ে নেবার মত নিশ্চয়ই নয়।
দেয়ালের ঘড়িতে সুস্পষ্ট চারটে শব্দ হল। চিত্রা চমকে উঠল। ওদের

আসার সময় এগিয়ে এল ভেবে, ব্যস্ততার সঙ্গে পোশাক প্রসাধনে তৎপর হল। সাজতে গুছোতে সর্বক্ষণ সেই সময়কার স্মৃতি নিয়ে নড়াচড়া করল। সেই যখন সে কোনকালেই বিয়ে করবে না—এমন একটা স্থির সিদ্ধান্ত আঁকড়ে বসেছিল, তখনকার কথা।

সিদ্ধান্তের কথাটা সময় থাকতেই বাড়িতে জানিয়েছিল। কিন্তু কেন? সে সম্পর্কে কোনপ্রকার কারণ না দর্শিয়েই ছোট ভাইবোনদের বিয়ে দিতে বাবা মা-কে উদ্যোগী হতে বলেছিল। এ ধরনের সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্য বাবা মা-র তরফ থেকে কোন চাপ সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল না। মা চিরকালই তাঁর বেয়াড়া মেয়ে চিত্রার একগুঁয়েমিকে ভয় পেতেন। স্বভাবতই চুপচাপ ছিলেন। বাবার পক্ষে জোর খাটাবার মানসিক শক্তি ছিল না। কেননা, চাকরি থেকে অবসর নেবার অনেক আগে থেকেই তিনি চিত্রার রোজগারের টাকার ওপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। ফলত চিত্রার ইচ্ছানুসারেই দু'বোন এবং হালে ছোট ভাইটিরও বিয়ে হয়ে গেছে।

এই সেদিনও চিত্রা লক্ষ্য করেছে, তার বাবা নিবারণ গুপ্ত অত্যন্ত আগ্রহ সচেতনতার সঙ্গে দৈনিক খবরের কাগজে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতেন। উপযুক্ত স্থান বুঝে নিয়মিত চিঠি লেখালেখি, ফোনে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত আশায় এগিয়ে গিয়ে শেষে নিরাশ হতেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়তেন না। পরে যথারীতি একই পদ্ধতিতে চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত বিয়ের তিন তিনটে ভাল সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছেন, এটা আনন্দের কথা।

চিত্রার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে, বাবা এতদিনে চিন্তামুক্ত এবং খুশি হতে পেরেছেন। ধারণাটা হঠাৎ গতকাল পাল্টে গেছে। কাল শনিবার বাবার নামে একখানা চিঠি এসেছিল। রাত্রে চিঠিটা হাতে করে বাবা শোবার ঘরে এসেছিলেন। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সংযতভাবে বললেন, তোর অজান্তে একটা ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছি। এখন তোর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। নয়ত সমস্ত শ্রমটাই বৃথা।

চিত্রা প্রথমাবস্থায় ব্যাপারটা আদৌ আঁচ করতে পারেনি। সাংঘাতিক একটা কিছু বিপদ ঘটতে চলেছে এমন আশঙ্কায় যথেষ্ট সাহস জুগিয়ে বলেছে, তোমাকে তো সাধ্যমত সাহায্য দিয়েই আসছি। ব্যাপারটা নিশ্চিন্তে বলতে পার। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।

শুনে বাবা একগাল হেসেছিলেন। পরম উৎসাহে বললেন, কিছুদিন আগে

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। পাত্রপক্ষের বিজ্ঞাপনে ছাপা ছিল, পাত্র বৈদ্য। বয়স বিয়াল্লিশ। বি, কম—ব্যবসায়ী। কলকাতার উপকণ্ঠে নিজস্ব জমি বাড়ি। কোনপ্রকার দায়দায়িত্ব নেই। সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ পাত্রী চাই। অসবর্ণা অথবা নিঃসন্তান বিধবাতেও আপত্তি নেই। আমি তাই—

বাকিটা বলতে হয়নি। চিত্রা বুঝে নিয়ে কথা জুড়েছে, তাই চিঠিতে যোগাযোগ করেছিলে এই তো ? কিন্তু কেন ?

চিত্রার গলার স্বরে কৈফিয়ৎ তলবের বিন্দুমাত্র রেশ ছিল না। কোন রাগ ক্ষোভের মেজাজও নয়। বরং যথেষ্ট শান্ত নম্র সংযত। নিবারণ তবু অপরাধীর মত অসহায় নীরব দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর মৃদু গলায় আবেগের সঙ্গে বললেন, আমি যে তোর বাপ। মনে করিস তোর মনের অবস্থাটা বুঝি না ? সব বুঝি। তাছাড়া, ওদের সকলের বিয়ে হয়ে যেতে আমার মনেও কোথায় যেন একটা অপরিপূর্ণতা অনুভব করছি। নিজেকে কেন জানিনা অপরাধী মনে হচ্ছে।

শেষের কথাগুলো চিত্রার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। দারুণ দুর্বলতা অনুভব করেছিল। কথাটাতো সত্যি, সে এখন নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। অপরিপূর্ণতার নৈরাশ্যে ক্রমশই অসহায় বোধ করছে। মনে মনে একটা অবলম্বন চায়। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে সে তার বাবা নিবারণকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে বলেছিল। নিবারণ মেয়ের নীরব সম্মতি পেয়ে খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

গতকালের চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী সেই পাত্রপক্ষ আজ দেখতে আসবে। পোশাক প্রসাধন সেরে চিত্রা শেষবারের মত বসার ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিল।

নিবারণ বৈঠকখানাতে বসে আছেন। অনিবার্য কারণবশত ভাই উপস্থিত থাকতে পারেনি। সে এখন বাইরে। চিত্রা রান্নাঘরে ভাই-বৌ রত্নাকে জলখাবারের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। ফিরে এসে আর একবার আয়নার সামনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াল। নিজেকে খুব ভাল করে দেখল। তারপর জানলার ধারে এসে বাইরে আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকাল। তামাটে আকাশ পড়ন্ত রোদ্দুর এবং অনেকদিন আগে ফোটা ঈষৎ ম্লান কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হল। নিজের মনেই নানারকম স্বপ্নের আঁক কষল।

চিত্রার মনের ভিতর কাল রাত থেকেই অনেকগুলো বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরে ফিরে সেগুলোই আবার মনে এল। ভাবল, পাত্র বিপত্নীক, নাকি আদৌ বিয়ে করেনি। বিয়ে করে থাকলে সন্তানাদি আছে কিনা। যদি বিয়ে না করে থাকে তবে এতকাল করেনি কেন।—এ জাতীয় অজস্র প্রশ্ন মনে এল যা নিজের মুখে বাবাকে জিগ্যেস করা যায় না। তাই নিজে থেকেই এক

একটা অনুকূল উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করল।
একটু বাদেই ওরা এসে গেল। ভিতর ঘর থেকে চিত্রা কাউকেই দেখতে পেল না। রত্না এসে খবর দিল, পাত্রের দিদি পাত্র আর তার এক বন্ধু এসেছে। কোন্‌জন যে পাত্র ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে দুজনকেই দেখতে খুব ভাল। সুশ্রী সুন্দর স্বাস্থ্য।
চিত্রা চোখ মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে মনে মনে সবিশেষ উৎসাহ বোধ করল। নিজের মনেই ভাবল, এই বয়সের বিয়ে তার আবার ভালমন্দ। মোটের ওপর নির্ভরযোগ্য একজন হলেই হল।
রত্না রান্নাঘরে। চিত্রা কৌতূহল বশে চোর পায়ে বৈঠকখানার ভিতর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। খুব সন্তর্পণে নিজেকে আলমারির ধারে আড়াল করে দাঁড়াল। ভিতরের পর্দাটা হাওয়ায় অল্প উড়ছে। ওরই ফাঁক দিয়ে নজর বুলিয়ে শুধুমাত্র বাবা নিবারণ আর একজন মধ্যবয়স্কা মহিলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অপর দু'জন ভিতর দেওয়ালের দিকে বসেছে ; তাই তাদেরকে দেখতে না পেয়ে একটু নিরাশ হল।
এঘর থেকে ওদের আলাপ আলোচনা স্পষ্টত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নিবারণ নিজের ঘরদোর সংসার আর সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি পাতা একে একে খুলে ধরছিলেন। একসময় নিজের দুঃখ দৈন্য এবং অক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনার ইতি টেনে বললেন, আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার আশা আমার কাছে দিবাস্বপ্নমাত্র— আমি ভাবতেই পারছি না। মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় এবং সম্বন্ধ হয়ই— ভাবব ভগবানের অশেষ করুণা।
ভদ্রমহিলার চেহারা পোশাক আশাকে আধুনিক আভিজাত্যের চূড়ান্ত স্বাক্ষর। নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছেন। উঁনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি কিন্তু আমাকে দেখে ভাইকে বিচার করবেন না। ও বরং উল্টোটাই। ওর কোনকিছুরই অভাব নেই, সত্যি। আমাদের সোসাইটিতে ওকে মিশবার যথেষ্ট সুযোগও দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর দেখছি, সাধারণ ঘরের মেয়েই পছন্দ। এতকাল তো বিয়ে করবেই না বলে আসছিল। বাবা মা আমি কত বুঝিয়েছি, শোনেনি। বাবা মা মারা যেতে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। ভালমন্দ দেখাশুনোর জন্য একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন তো চাই-ই। ওর বিশ্বাস, সেটা সাধারণ ঘরের মেয়ের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।
চিত্রা প্রস্তাবিত পাত্রটিকে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই ঠিক বুঝতে পারল না, এসব কথায় তার মুখের চেহারাটা বর্তমানে কীরকম দেখাচ্ছে। তবে না-দেখেও মনটা তার অনেক কাছাকাছি চলে গেল। শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রীতিতে সে তাকে অনেক

কাছে একান্ত আপন করে ভাবতে চাইল। ভাবল, এই বয়সে ঠিক এমন একজন পুরুষের আশ্রয়ই একান্ত প্রয়োজন।

রত্নার পায়ের আওয়াজ শুনে চমক ভাঙল। চিত্রা চকিতে দরজার কাছ থেকে সরে এল। রত্না বারকয়েক যাতায়াতে যথাস্থানে খাবারের প্লেট ট্রে টীপট পৌঁছে দিল। সবশেষে জলের গ্লাসগুলো নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, দিদিকে কী এখনই নিয়ে আসব—নাকি খাবার শেষে?

পুরুষকণ্ঠের জবাব শোনা গেল, দেরী করে লাভ কি? আপনি বরং আসতে বলুন। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।—সম্ভবত পাত্রের বন্ধুর কথা।

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। শেষবারের মত কাপড়ের ভাঁজগুলো টেনে নিল। পাত্রী হিসেবে জীবনে প্রথম পাত্রের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কিন্তু বিন্দুমাত্র দুর্বলতা উত্তেজনা কিংবা রোমাঞ্চ অনুভব করল না। রত্না এগিয়ে এসে চোখের ইশারায় যেতে আহ্বান জানাল। দরজার পর্দাটা আলতো করে তুলে ধরল। চিত্রা মাথা নুইয়ে ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকল। রত্না পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে চিত্রার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিবারণ পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি পাত্রের দিদি মিসেস আইভি সেন। চিত্রা করজোড়ে নমস্কার জানাল। মিসেস সেন নীরবে প্রত্যুত্তর দিলেন। সেইসঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশে পরিচয় দিলেন, ইনি আমার ভাই-র বন্ধু মিঃ দিবাকর বসু। চিত্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশিত লক্ষ্যে নমস্কার বিনিময় করল। অতঃপর মিসেস সেন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, আমার ভাই আদিত্য, পাত্র।

চিত্রা এতক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। চোখ তুলে নমস্কার জানাতে গিয়ে চমকে উঠল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। নমস্কার বিনিময়কালে সমস্ত দেহমনের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বুকের ভেতর অতি দ্রুত তীব্র স্পন্দন অনুভব করল। পা দুটো কাঁপতে থাকল। মাথাটা ভারী হয়ে এল। অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হল। অথচ ব্যাপারটা কেউ কাউকে বুঝতে দিল না। পাশ থেকে মিসেস সেন বললেন, আপনি বসুন।

বসতে পেরে চিত্রা অনেকটা স্বস্তি পেল। সুস্থ অনুভব করল। নিজেকে স্বাভাবিক সতেজ করে তুরতে চেষ্টা চালিয়ে গেল। দিবাকর আর আদিত্যকে উদ্দেশ করে মিসেস সেন বললেন, তোমাদের যা কিছু জিজ্ঞাস্য—আরম্ভ করতে পার। দেরী করে লাভ নেই।

দিবাকর খেতে খেতে চিত্রার নাম জিজ্ঞেস করল। চিত্রা নাম বলল। হঠাৎ একটা বোবা মুহূর্ত। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। দিবাকর কী জিজ্ঞেস করবে, ভেবে পেল না। অগত্যা বিরক্তিকর নীরবতা কাটাতে যথারীতি সেই সব

মামুলী প্রশ্ন জুড়ল,—অর্থাৎ কিনা কোন্ সালে বি এ পাশ করেছেন ? কোন্ কলেজ থেকে ? চাকরিতে ঢুকেছেন আজ ক'বছর হল ? বিয়ের পরেও চাকরি করার ইচ্ছা আছে কিনা ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিত্রা একে একে প্রতিটি প্রশ্নের সাবলীল জবাব দিল। ভবিষ্যতে চাকরি করার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন উত্তর দিল না। এড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিল, সেটা ভবিষ্যতের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। দিবাকর মিসেস সেনকে অনুরোধ জানাল, এবার আপনি কিছু জিজ্ঞেস করুন। মিসেস সেন হাত তুলে মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন, আমি না। পরে আদিত্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তুমি সংসার পাতবে। সুতরাং পছন্দ-অপছন্দ সব তোমার। যা কিছু জানবার, তোমাকেই জেনে নিতে হবে।

আদিত্য শুনেও শুনল না। কোন জবাব দিল না। সে অনেক গভীরে চিন্তামগ্ন। ঝুঁকে-পড়া মাথা। সামনের টেবিলে দৃষ্টি স্থির। সে দু'হাতের আঙুলে আঙুল জুড়ে অতীত-স্মৃতি নিয়ে বিব্রত বোধ করছিল। ফেলে-আসা উড়ন্ত জীবনের বুদ্‌বুদ্ দিনগুলোর কথা ভাবছিল। সেই যখন সে নিত্য নতুন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব ভালবাসার অভিনয় করত। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য নিরাপদ ঘর খুঁজে বেড়াত। সময় ও সুযোগ পেলে দূরে কাছে হোটেল বাংলোয় দু'এক রাত্রি বেড়িয়ে আসত। টাকা জীবন-যৌবন ভোগবিলাস নিয়ে জীবনের গতি বজায় রাখত। শেষ বয়সের ক্লান্তি নিঃসঙ্গতা এবং অবলম্বন—এ সবের কথা ভুলেও ভাবত না। সেই সময় কোন একদিন ক্রিকেট-টেস্ট মাঠে চিত্রার সাথে হঠাৎ পরিচয়। পরে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা। সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল, চিত্রা বিবাহ-প্রত্যাশী নয়। সম্ভবতঃ চিত্রাও তাকে বুঝেছিল। কাউকেই তাই ভালবাসার অভিনয় করতে হয়নি। কিছুদিন ঘনিষ্ঠতর মেলামেশার পর এক সময় ইচ্ছে করেই দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আজ প্রায় বছরদশেক পরে দু'জনে আবার দেখা। সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায়। পরিবেশ মানসিকতা প্রত্যাশাও ভিন্নতর। উভয়েই উড়তে উড়তে আজ ক্লান্ত বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ। অবসন্ন ডানাদুটো গুটিয়ে বসতে উৎসুক। এই মুহূর্তে দু'জনে দু'জনের শূন্যমনের জমাট কান্নার ছোঁয়া পেল। অথচ বিশ্বস্ত দুটি হৃদয় মুখোমুখি নির্বাক বসে থাকল। কোনমতেই একে অপরকে বিশ্বাস করতে ভরসা পেল না।

স্বর্গচ্যুত

'মাত্র পনেরো ঘণ্টায় অন্য পথে অমরনাথ দর্শন করে ফেরা যায়। পহেলগাঁও দিয়ে যাতায়াতে পাঁচদিন লাগবে। এবার আপনারা ভেবে ঠিক করুন কোন্ পথে যাবেন।'

শ্রীনগর পৌঁছে অনঘ তার দলের সামনে প্রস্তাবটা রাখল। এটা তার ব্যবসা নয়, বেড়াতে ভালবাসার নেশা। স্কুলে ছাত্র পড়ায়। একঘেয়েমি এসে গেলে দশ বারজন যাত্রী যোগাড় করতে পারলেই কোন ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিজের খরচটা বাঁচে। এবার তা করেনি। একার দায়িত্বেই দশজনের দল নিয়ে এসেছে।

এত কম সময়ে অমরনাথ দর্শন! পঞ্চান্ন পেরুনো প্রলয় তালুকদারের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। ধাতস্থ হয়ে বলল, 'এ যেন ব্যাক ডোর দিয়ে কাজ হাসিল করা হবে। কোথায় যেন একটা শূন্যতাও থেকে যাবে।' রামশরণ শর্মা নিজে একা একবার পহেলগাঁও পথে অমরনাথ দর্শন করে গেছে। এবার তার একমাত্র সন্তান মা মরা মেয়ে সুরিটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মেয়ের জন্যই আসা। নতুন সহজ পথের সন্ধান পেয়ে সবিশেষ উৎসাহ বোধ করছিল। তন্ময় তরুণ। এক আধটু সাহিত্যচর্চা করে। নিরাশ হয়ে বলল, 'শুনেছি এপথে তেমন আই ক্যাচি বিউটি নেই। তাছাড়া জীবনের ঝুঁকিটাও বেশি।' তাকে বোঝাতে পবিত্র পাণ্ডে যুক্তি দেখাল, 'যেখানে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য সেখানে ভীড় কম হয়। নোংরা নোংরামি জমে ওঠে না। শান্তি পবিত্রতা বজায় থাকে। সেজন্যেই দেবদেবীর মন্দির দুর্গম স্থানেই হয়। আর সব তীর্থেই ঝুঁকি থাকে।'

'ওসব আপনার ভাববার কথা।' তন্ময় বলল, 'এই বয়সে আমি তো তীর্থধর্ম করতে আসিনি। স্বর্গসৌন্দর্য দেখতে চাই।'

জগন্নাথ ডাক্তার রথ দেখা কলা বেচার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। অথচ কথা বলল দার্শনিকের মত, 'সৌন্দর্য টৌন্দর্য সে তো দেখার গুণে। কিছুটা উপলব্ধির ব্যাপার স্যাপারও।'

তন্ময় তবু ভায়া পহেলগাঁও পথেই বিশেষ উৎসাহী। সমর্থন আদায়ের জন্য

ফের নতুন কারণ দর্শাল, 'পহেলগাঁওয়ের পথ ঐতিহাসিক ও পবিত্রতার প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা স্বামী অভেদানন্দর মত মহান ব্যক্তিরা ও পথেই গিয়েছিলেন। ওপথে অনেক মুনিঋষি মহাত্মার পা পড়েছে।'
তন্ময়কে ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে পবিত্র পাণ্ডে বলল, 'একটু আগেই তো বলছিলে, তীর্থধর্ম করতে আসনি। ভেবেছিলাম, তুমি নাস্তিক। এখন আবার যা বলছ তাতে তোমাকে রহস্যময় লাগছে।'
অনঘ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। দেখল, এত জনের মতামত নিতে গিয়ে সমস্যা বাড়ছে। তন্ময় আর পবিত্র পাণ্ডের বিতর্কটা তিক্ততার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি পাঁচমত এক করুন। একটা পথ তো বেছে নিতেই হবে।'
অম্বরীশ আজ পর্যন্ত কোথাও বেড়াতে বের হতে পারেনি। অভাবী দাদার সংসারের দায়-দায়িত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। নানা সমস্যার সংসারের সংগ্রামে শরীরে অকালবার্ধক্য। ভগ্ন স্বাস্থ্য। অনঘের বিশেষ বন্ধু। অনঘই একরকম জোর করে ভরসা দিয়ে নিয়ে এসেছে। শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছাতেই তার শরীরে ক্লান্তি নেমে এসেছিল। তাই মাত্র পনেরো ঘণ্টার পথে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমরা কে আর কতটুকু ভালমন্দ বুঝি? অনঘের ভরসায় ওর দায়িত্বে যখন এসেছি ওর নির্দেশমতেই আমাদের সকলের চলা উচিত।'
সকলে একমত হয়ে কোরাস ধ্বনি তুলল, 'ঠিক কথা। এসেছি অনঘ মাস্টারের সঙ্গে, চলব তারই নির্দেশ মতে।'
অনঘ আগে থেকেই স্পেশাল ট্যাক্সির পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ভোর রাতের অন্ধকারে যাত্রা শুরু। শ্রীনগর থেকে শোনমার্গ হয়ে বালতাল পর্যন্ত ট্যাক্সিতে যেতে হয়। বালতাল থেকে অমরনাথ গুহা মন্দিরের দূরত্ব মাত্র তের কিলোমিটার। বালতাল থেকে এই পথটুকু ঘোড়ায় যাতায়াত।
মাঝে চা জলখাবার খেতে শোনমার্গ নামতে হল। ভোরের আলো স্পষ্ট। হাড় কাঁপুনি শীতে ঝিরঝির বৃষ্টির মত কুয়াশা ঝরছিল। শীতের পোশাক পাহাড়ে ওঠার সাজ-সরঞ্জামের অনেকগুলি দোকান। আরো বেশ কিছু যাত্রী জমে উঠেছে। চারদিকে মানুষজনের চোখ নাক মুখটুকুই যা বেআব্রু। তবু দেবারতিকে চিনে নিতে অম্বরীশের ভুল হল না। দু'জনের কাছেই এ যেন এক বিস্ময়কর স্বপ্ন।
'তুমি?' বিস্ময়ের সঙ্গে দেবারতি জিগ্যেস করল।
'হ্যাঁ, আমি তোমার অম্বরদা। এখনো অকৃতদার। কার সঙ্গে এসেছ?'

'পরিচিত একজনদের সঙ্গে। একাই এসেছি।'
'বল কী! একা তোমাকে ছাড়ল?'
'উপায় কী। তাঁর বিশ্বাস নেই। আমার আছে।'
'কীসের বিশ্বাস?'
'ধর্মে। দেবমাহাত্ম্যে। তুমি কি এখনো দাদার সংসারের দায়দায়িত্বেই বাঁধা আছ, নাকি ছাড়া পেলে?'
'ছেলেমেয়েরা মোটামুটি বিবাহিত প্রতিষ্ঠিত। তাইতো কিছুটা মুক্ত বলেই আসতে পারলাম। এলাম বলেই তোমার সঙ্গে দেখা হল। ঈশ্বর করুণাময়। হয়ত তিনিই মিলিয়ে দিলেন।'
'বোধহয় তাই। তা প্রায় পঁচিশ বছর পরে আবার দেখা হল। পৃথিবীটা কত পাল্টে গেছে তাই না?'
'আমরাও তো কত পাল্টে গেছি। তবু আশ্চর্য দেখ, কত সহজেই দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারলাম।'
দু'জনে ভিড় থেকে একটু দূরত্বে কথা বলছিল। দল থেকে ডাক পড়তে দেবারতি বলল, 'আমি এগুচ্ছি।' এই বয়সেও অম্বরীশের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। এতক্ষণ শীত যেন কোথায় লুকিয়ে ছিল, আবার ফিরে এল। ঠোঁট কাঁপিয়ে অম্বরীশ বলল, 'পথে যদি আর দেখা না হয় শ্রীনগর ফিরে দেখা করো। 'হোটেল ঝিলম্'এ উঠেছি। ডাল লেকের কাছেই।'
'কী হবে দেখা করে?'
'কথা হবে। পঁচিশ বছরের বকেয়া কথা।'
'সবইতো শূন্যতায় ভরা। ফাঁকা ফাঁকা।'
'শূন্যতা কেন বলছ? স্বামী সংসার সন্তান নিয়েই তো মেয়েদের পরিপূর্ণতা। দুঃখটা বরং আমার করা সাজে।'
প্রত্যুত্তরে দেবারতি যা বলে গেল তাতে অম্বরীশের বিষণ্ণতা আরো বেড়ে গেল। দেবারতির স্বামী নাকি বিপ্লবী কম্যুনিস্ট কমরেড। ধর্ম তার কাছে আফিং। ওদের দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে সন্তান আসেনি। দেবারতি এখনো আশা ছাড়েনি। বিশ্বাস হারায়নি বলেই স্বর্গতীর্থে এসেছে।
ভোরের দিকে বরফ শক্ত থাকে। পরিশ্রমও কম হয়। বিকেলের দিকে কোন কোন দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি আসে। জলদি রওনা হওয়ার জন্য অনঘ চটপট ঘোড়া ভাড়া করে ফেলেছিল। সহিসরা কে কার আগে পৌঁছাবে—ব্যস্ত প্রতিযোগিতায় ঘোড়া হাঁটিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দল থেকে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনঘের নির্দেশমতো সবার হাতের

লাঠিতে রুমালের উড়ন্ত নিশান জানান দিচ্ছে, কে কতটা দূরত্বে এগিয়ে পিছিয়ে আছে। সবশেষে অম্বরীশের কাছাকাছি পিটার বিশ্বাস চলছিল।
প্রথম ঘণ্টার পথ সবুজ পাহাড়ঘেরা রমণীয় উপত্যকার ওপর। জোজিলা গিরিবর্ত্মের নিচে শান্ত সবুজ প্রকৃতি। কাঁকুড়ে মাটি পাথুরে পথ। সবুজ পাহাড়। বরফগলা সফেন নীল সবুজ নদীর আলপনা। পাহাড়ি মানুষজন। ভোরের নরম রোদ্দুর। বরফশীতল শিরশির হাওয়ার স্পর্শ। ইতস্ততঃ বিচিত্র বর্ণের পাহাড়ি ফুল পাখি। এসব দেখে অম্বরীশের হাঁটতে ইচ্ছে হওয়ায় ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটছিল। পিছন থেকে পিটার বিশ্বাস মন্তব্য করল, 'ঘোড়া থাকলে খোঁড়া হয় জানতাম। আপনি ঘোড়া থাকতেও হাঁটছেন? অসুস্থ মানুষ হাঁপিয়ে যাবেন যে।'
'আপনি তো এ্যাডভেনচারিস্ট। সুস্থও বটে। এই ভ্যালিটুকু হেঁটেই দেখুন না, খু-উ-ব মজা পাবেন।'
পিটার বিশ্বাস অল্প বয়সী শক্ত সমর্থ পুরুষ। শ্রীনগরে বলেছিল, 'অমরনাথ গিয়ে কী হবে? এখানে বেড়াব ঘোড়া শিকারায় চড়ব। মনের সুখে পান করব বিশ্রাম নেব।' সকলের অনুরোধে সেসব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র এ্যাডভেনচারের জন্য এসেছে। অম্বরীশের কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে পিটার বিশ্বাস কোন জবাব দিল না। ঘোড়া টগবগিয়ে নওজোয়ানের মত এগিয়ে গেল।
গুজরাটি ধরমশালা থেকে পথটা বেশ খাড়াই। ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে অম্বরীশ থমকে দাঁড়াল। যাত্রীদের দেখভাল করার জন্য কয়েকটা অস্থায়ী ছাউনি ফেলা হয়েছে। একটা ছাউনির সামনে পাথরের ওপর একা দেবারতি বসে আছে। চোখমুখে উদ্বেগ বিষণ্ণতা। সহিস হাত পা নেড়ে কীসব বোঝাবার চেষ্টা করছে যেন। বালতাল থেকেই অম্বরীশ সন্ধানী চোখ মেলে দেবারতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে কাছে এগিয়ে গেল।
'একা বসে আছ, সঙ্গীরা কোথায়?'
'আমাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে।'
'কেন?
'আমার কষ্ট হচ্ছিল, ভয় করছিল তাই। এখানেই থাকতে বলে গেছে। ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরবে।'
'নেহি মাঈজী। আপ জরুর জানে সেকীত হ্যায়। আপ ইনাম দেঙ্গে, হাম আপকো মদত করেঙ্গে। জিন্দেগী মে এ্যায়সা মওকা ফির কভী নেহি আয়েগী।'

সহিস হয়ত এতক্ষণ এসব কথাই বোঝাচ্ছিল। আবারও বলল। দেবারতি বিরক্ত হয়ে বলল, 'না বাবা না। কিছুতেই যাব না। তোমার টাকা পেলেই তো হল। ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত এখানেই বসে থাকব।'

দেবারতি একটিও হিন্দী শব্দ ব্যবহার করল না। সহিস সবই বুঝতে পারল। মাঈজীর রাগ ক্ষোভ অভিমান হতাশা লক্ষ্য করে মুশকিলআসান হিসেবে অম্বরীশকে বলল, 'আপ সমঝাইয়ে সহাব। রুপায়া মিলেগা জরুর, লেকিন মাঈজীকা দিল্ দুখ্ তো রহেগী। এ মেরা ফর্জ হ্যায়।'

'রতি তুমি চল। স্বর্গতীর্থে এসেছ, বিশ্বাস হারালে চলে? সহিসরাই তো এখানকার সারথি। তাছাড়া, এখন তো আমিও থাকছি।'

দেবারতি যেন এই চিরনির্ভর ভরসাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। পঁচিশ বছর আগে অম্বরীশের জন্মদিনে লিখে দেয়া কোটেশানটুকু মনে পড়ে গেল। প্রীতি উপহারের বইয়ের প্রথম পাতায় লিখে দিয়েছিল, 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি··· তুমি চিরমঙ্গল সখা হে।'

পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে দেবারতি বলল, 'জান অম্বরদা, ওরা আমাদের আত্মীয়ের মত। কিনা করেছি ওদের জন্য। ওদের ভরসাতেই তো আমাকে পাঠিয়েছিল। কী করে যে আমাকে একা ফেলে যেতে পারল!'

'সেটাই নিয়ম। তোমার যখন যৌবন ছিল রূপ অর্থ অহংকারে কতজনকেই তো ফেলে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলে। তাদের কষ্টটা কী কখনও বুঝেছ?'

দেবারতি কোন জবাব দিল না। বলার মত কিছু ছিলও না। সত্যিই তো তাই। কিছুদিন গভীর ভাবে কারও সঙ্গে মেলামেশা। অন্ধ প্রেম ভালবাসা। তারপর কোন এক অজুহাতে নতুনের হাত ধরে পুরাতনকে বিদায় দেয়া। সগর্বে বলতে বাধত না, 'যেখান থেকে একবার মুখ ঘোরাই মুখ ফেরাই না সেখানে। কাউকে ছেড়ে দিতে আমার এতটুকু কষ্ট হয় না। বরং, যাদের ছেড়ে দেই তারা সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরে।' অদ্ভুত মাদকতায় ভরা এক ধরনের খেলা ছিল। নিজে জ্বলত না। অপরকে জ্বালিয়ে মজা পেত। কোন কারণ ছিল না। এক ধরনের নেশা হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ের গা ঘেঁষা সর্পিল সংকীর্ণ পথ। ঘোড়াগুলি নিখুঁত পা ফেলে ব্রেক কষে খাদের দিক দিয়ে হাঁটছিল। অনেক নিচে উচ্ছল নদী বেগবতী। ওপর থেকে তাকালে বুকের ভেতর কাঁপন ধরে। অম্বরীশ দলের লোকজন থেকে বিরাট ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল। অনঘ খুঁজতে খুঁজতে ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এল।

'একে তো সবার শেষে। তারপর এতটা পিছিয়ে পড়েছিস?'

'আমার জীবনটাই তো তাই। সারা জীবনে আর এগিয়ে যেতে পারলাম কই?'
'সংসারের বন্ধনে থাকলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। এখানেও নিশ্চয়ই সেই সংসারের চিন্তাই করছিস?'
'বন্ধন মুক্তি ভালবাসা—সবই তার ইচ্ছা।' দেবারতিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখতো চিনতে পারিস কিনা। কিছু দিনের জন্য মুক্ত পুরুষ হতে চেয়েছিলাম, তিনি আরেকটি বন্ধন চাপিয়ে দিলেন।'
দেবারতির ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। এ হাসিটা যৌবন কালে অনেকেরই প্রিয় ছিল। বিশেষ ভঙ্গিমায় দুর্বোধ্য হাসিটা দেখে অনঘ নাম দিয়েছিল, মোনালিসা।
'মোনাসিলা না? কোত্থেকে জোটালি?'
'জোটাল' আবার কী ধরনের কথা?' দেবারতি কপট রাগ দেখাল।
'স্যরি। জানতে চাইছিলাম, কেমন করে দু'জনে এক হলে। এ্যাক্সিডেণ্টালি নাকি চুপকে চুপকে পরিকল্পনা করে?'
অম্বরীশ বিস্তারিত সব জানিয়ে বলল, 'তোর দলে আরেকজন বাড়ল। ধরমশালায় ফিরে আসা পর্যন্ত যা কিছু দায়িত্ব। আপত্তি আছে কী?'
'দায়িত্ব তো নিয়ে বসেই আছিস। এখন আর এ প্রশ্ন কেন।' দেবারতিকে উদ্দেশ করে বলল, 'সবই মহাশক্তিমানের ইচ্ছা নির্ভর। তাঁর ওপর ভরসা রাখ, ঠিক পেঁৗছে যাবে।'
মুল রাস্তা বাঁয়ে ফেলে ডানদিকে বয়ফ ঢাকা উপত্যকায় সারিবদ্ধ যাত্রীরা এগিয়ে চলছিল। পাশে অমরগঙ্গা নদী। নদীটির সিকিভাগ জল, বাকি তিনভাগ জমাট বরফ। সিকিভাগ জলও অনেকস্থানে জমাট বরফের নিচে লোকচক্ষুর অন্তরালে। অন্তঃসলিলা। কখনও প্রকাশ্যে উচ্ছল দ্রুত। কোথাও বা ফুঁসছে সাপিনীর মত। যাত্রীরা যেন সারিবদ্ধ পিঁপড়ে যত। ঘোড়া ছুটিয়ে অনঘ সামনের যাত্রীদের দেখতে এগিয়ে গেল।
সামনে আকাশছোঁয়া তুষার ঢাকা উচুঁতে উঠতে হবে জেনে দেবারতি বলল, 'অসম্ভব। আমি কিছুতেই পারব না। আমার শরীর ঘামছে। অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাব।'
সামনে জিনস্ পরা ভরা যৌবনের সুরিটা। মেয়েটা বেশ দুঃসাহসী। প্রলয় তালুকদারও বেশ চনমনে। অম্বরীশ ভরসা দিয়ে বলল, 'মাথার হনুমান টুপিটা খুলে ফেল।'
দেবারতি টুপি খুলেও সহজ হতে পারছিল না। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল। অম্বরীশ কাছে এসে কোমর ধরে নিচে

নামাল। তুলোর মত একমুঠো বরফ হাতে দিয়ে বলল, 'মুখে বুলিয়ে নাও আরাম পাবে।' সহিস বলল, 'লেকিন খাইয়ে মৎ। এ চীজ বহুত খতরনক। খানেসে বিমারী হোগী।'

কিছুটা সুস্থ হতে অনঘ এসে ফের কাছে দাঁড়াল। দেবারতিকে ঘোড়ায় তুলে দিয়ে বলল, 'গভীর বিশ্বাস আর মানসিক দৃঢ়তাই একমাত্র স্বর্গদ্বারের চাবিকাঠি। তোমরা আস্তে আস্তে এসো আমি এগিয়ে যাচ্ছি।'

অনঘ চলে যেতে দেবারতি জিগ্যেস করল, 'আমি কী শেষ পর্যন্ত যেতে পারব অম্বরদা?'

'নিশ্চয়ই পারবে।'

'কীসের বিশ্বাসে এত জোর দিয়ে বলতে পারছ?'

'সেই গানটা শোননি?' অম্বর সহজ হতে কথার জাল বুনল, "ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালবাসবে?" যাঁর কাছে যাচ্ছ তাঁরও তো ওরকমই প্রশ্ন, কতটুকু আর কষ্ট করেছ যে আমার কাছে আসবে? আমি জীবনে এত কষ্ট করেছি বলেই সেখানে পোঁছানোর বিশ্বাস আছে। তুমিও সেই বিশ্বাস অর্জন কর—ঠিক পোঁছে যাবে।'

'এরকম বিশ্বাস নিয়ে যদি আবার তোমার কাছে আসতে চাই?'

'হয়ত আসবে।'

'এই বয়সে?'

'বয়স কী শুধু বছরেই বাড়ে?'

দুধারে বিচিত্র বর্ণের বিশাল পাহাড় প্রাচীর। গিরিপথের দুধারে দেবদারু শিশম ভূর্জপত্র ও অন্যান্য বনজ গাছে ভরপুর। নানারকম পাহাড়ি ফুল। বরফের চাদর ঢাকা রমণীয় উপত্যকা ভালই লাগছিল। ভাললাগা বড় ক্ষণস্থায়ী। কিছু পরেই নিরেট ন্যাড়া পাহাড়। হঠাৎ বিপদ এগিয়ে এল। পাহাড়ের ওপর থেকে কয়েকটা বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে নিচে নামছিল। ধস নামার পূর্বাভাস। যাত্রীদের উদ্বেগ ভীতি চিৎকার চেঁচামেচিতে সব সৌন্দর্য ঈশ্বর অধ্যাত্ম চেতনা বিশ্বাস নিমেষে উধাও। সহিসদের তৎপরতায় ছোটাছুটি ব্যস্ততায় ঘোড়া ছুটিয়ে ছত্রখান যে যেদিকে পারল ছুটল।

বিপদ সীমানা ছাড়িয়ে লাঠির নিশানায় আবার সকলে যখন একত্রিত হল রামশরণ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মেরে বেটি কাঁহা চলি গেই?' অনঘ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ডোণ্ট ওরি। হয়ত আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থাকবে। সহিস তো সঙ্গে আছে।'

'তন্ময়কেও আমি সঙ্গে দেখেছি।' প্রলয় তালুকদার বলল।

'ও লেড়কা আচ্ছা নেহি থা। জরুর বেটিকো লেকড় ভাগ গিয়া হোগা।' রামশরণ আবার কেঁদে উঠল। সবাই করুণার পরিবর্তে ইঙ্গিতে হাসাহাসি করছিল। এমন সময় একা সহিস এসে বিপদমুক্ত সুরিটার খবর দিয়ে চিন্তামুক্ত করল।

একটা বড় পাথরের ওপর সুরিটা বসেছিল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েও হাতের লাগামটা ছাড়েনি বলেই যত বিপত্তি। তন্ময় ছুটে গিয়ে হাত থেকে লাগাম কেড়ে নেয়ায় বেঁচে গেছে। তন্ময় সুরিটার চোট লাগা হাতে ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল। দৃশ্যটা দেখে রামশরণ রেগে আগুন। সুরিটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, একটু আগেও কেঁদেছে। চোখমুখে উৎকণ্ঠা। বাবাকে দেখে আবার কেঁদে উঠল, 'ড্যাডী আই ওণ্ট বি রীচ দেয়ার। লেটস্ গো ব্যাক।'

'তা কখনও হয় না। সকলে এগিয়ে চলুন।' অনঘ ধমক দিয়ে বোঝাল, 'এপথে দাঁড়িয়ে পড়লেই যত বিপদ। চরৈবেতি।' তন্ময়ের পিঠে হাত রেখে বলল, 'ডোণ্ট মাইণ্ড। তোমার কর্তব্য তুমি করেছ। তিনি দেখছেন, ফল পাবে। মিঃ শর্মার কাছে সেই ফল পেয়ে গেলে আর কোন পাওনাই থাকত না। একথা আমার নয়—যীশুর।'

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই ছোট্ট একটা টিলা। পায়ে হেঁটে টিলাটা পেরিয়ে গেলে সংকীর্ণ একটা পথ। কয়েকশো ফুট নিচে হাঁ করা মুখের মত বরফ ফাটল গহ্বর। গহ্বরের ভেতর সফেন জল তোলপাড় করছে। যেন উদগ্র লালসায় শিকারের প্রত্যাশায় রয়েছে। উবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একে একে সকলে বিপদজনক পথটুকু পেরিয়ে যেতে অনঘ বলল, 'আর ভয় নেই। সামনেই অমরনাথের মন্দির।'

অমরগঙ্গা আর পঞ্চতরণী নদীর মিলনস্থল—সঙ্গম। পহেলগাঁও থেকে আর একটি পথ এখানে মিলেছে। উপত্যকাটির নাম ভৈরবঘাটি। স্বামী বিবেকানন্দ এখান থেকে স্নান করে ভেজা কাপড়ে পায়ে হেঁটে অমরনাথ গুহা মন্দিরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর অনঘ বলল, 'আমাদেরকেও এখান থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। যাদের ইচ্ছা স্নান করে নিতে পারেন।'

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাজার লোকের ভিড়ভাট্টা। লঙ্গরখানা বসেছে। তারপর হাড় কাঁপানো শীত। কেউ স্নানের নাম করল না। দেড়শোর মত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে গুহা মন্দিরে যেতে হবে। গুহার ভেতর প্রাকৃতিক বরফের শিবলিঙ্গ। দেবারতি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।'

'পারতেই হবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনঘ ধমক দিল।
কোমর ধরে অম্বরীশ নিজের কাঁধের ওপর ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করছিল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে দেবারতি অনির্বচনীয় সুখানুভূতির স্পর্শ পাচ্ছিল। প্রেম ভালবাসা কামনা বাসনা তুষের আগুন। নেভে না, সুপ্ত থাকে। হঠাৎ দমকা দামাল হাওয়ায় দাউদাউ জ্বলে ওঠে। শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল।
অনায়াসে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে দেবারতি ভাবছিল, অম্বরীশ ঠিকই বলেছিল, 'বয়স কী শুধু বছরেই বাড়ে?' প্রকৃতি পরিবেশ নির্মম নিষ্ঠুর অবাধ্য মুক্ত। পড়ন্ত যৌবনের নারী হৃদয়ের গোপন জলাশয়টি হঠাৎ যেন জলে টালটমাল হয়ে উঠছিল।
শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে পুণ্যার্থীরা উচ্ছ্বসিত উল্লসিত। বাবা অমরনাথের নামে হাঁকডাক চিৎকার কান্নাকাটির একশেষ। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দেবারতি সাময়িক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। জগন্নাথ ডাক্তারের সহায়তায় জ্ঞান ফিরে আসতে চুপচাপ অম্বরীশের পাশে বসে আছে। অনঘের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও পিটার বিশ্বাস গোপনে ডায়ুলেট করা ব্রাণ্ডি এনেছিল। শূন্য বোতলে অমরগঙ্গার জল ভরে আত্মমগ্ন উদাসী নির্বাক। মুখে প্রশান্তির প্রলেপ। অনঘ ফেরার তাগিদ দিতে বলল, 'আর কিছুক্ষণ থেকে গেলে হয় না?'
আকাশে সামান্য মেঘ জমে উঠেছে। অনঘ সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না। বৃষ্টি এলে মহামুশকিলে পড়তে হবে। জীবনের ঝুঁকিও আছে।'
উতরাই পথে ঘোড়ায় চড়ার চেয়ে পায়ে হেঁটে নামা সহজ নিরাপদ এবং কম কষ্টকর। উত্তর যৌবনের দুইসঙ্গী হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। শরীরের ভারসাম্য রাখতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিল। দেবারতি খিলখিল হেসে লুটোপুটি। অম্বরীশের ঠোঁটে ঝিলিক ঝিলিক হাসি। দুজনের যা কিছু দুঃখ কষ্ট ক্লান্তি বিষণ্ণতা উবে যাচ্ছিল। পরিবর্তে বড়ই উচ্ছল প্রাণচঞ্চল। নিষ্পাপ কিশোর কিশোরীর মত যত আচরণ।
ক্রমশঃ পিছনের পথ দীর্ঘতর হয়ে আসছিল। দূর ওপর থেকে নিচে উপত্যকায় গুজরাটি ধরমশালার দিকে তাকিয়ে অম্বরীশ গম্ভীর হল। ফিরে গেলে সেইতো অভাবী সংসার। সংগ্রাম শূন্যতা নিঃসঙ্গতা। স্বার্থভিত্তিক শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা প্রাপ্তি। দেবারতিও ভারাক্রান্তমনা। সন্তানহীনা নারীর কাছে রাজঐশ্চর্যও বৃথা। ভাবছিল, তার শূন্য কোল বুক জতুগৃহের কথা।
হঠাৎ অম্বরীশ জিগ্যেস করে বসল, 'তোমার সঙ্গীদের সাথে দেখা হল না তো! ফিরে গিয়ে যখন খোঁজ করবেন, তখনকার কথা ভেবেছ?'

মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে সঙ্গীদের দেখতে পেয়েও দেবারতি নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল। রাগ ক্ষোভ অভিমান তো ছিলই, অম্বরীশের সঙ্গ ছাড়ার ইচ্ছাও ছিল না। দেবারতি বলল, 'কী আর হবে ? দেখতে না পেয়ে চলে যাবে।'
'যদি থানা পুলিশ করে তখন ?'
'ভয় পাচ্ছ অম্বরদা ?' দেবারতির ম্লান দৃষ্টিতে বিস্ময় অভিমান। পরক্ষণেই ঠোঁট দৃঢ় করে বলল, 'আমি তো স্বেচ্ছায় তোমার সাথে এসেছি। শরণাগতকে ত্যাগ করা নিশ্চয়ই কোন পুরুষের ধর্ম নয়। তুমি তপস্বীও নয় যে নারীসঙ্গ বর্জনীয়। পরস্ত্রী হলেও আমরা 'মিত্র' তো বটে। 'মিত্র' শব্দের অর্থইতো পরস্পরের মনোরথ রক্ষা করা। আমরা দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। বরং, পরিপূর্ণতা প্রত্যাশী !—এই 'সত্য'টা কী অস্বীকার করতে পার ?'
অম্বরীশ নিরুত্তর। এতক্ষণে বুকের ভেতরকার শূন্যতা অনেকটা ভরাট হয়ে এসেছিল। হঠাৎই মনে হল, বুড়ো গাছটায় যেন নতুন করে ফুল পাতা গজিয়ে উঠেছে। বসন্তের হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

তারপর সেদিন সেই ধরমশালার ছাউনির সামনে দেবারতির সঙ্গীসাথীদের দেখতে পাওয়া যায়নি। অম্বরীশ আনন্দে পুলকিত হয়েছিল। অমরতীর্থ থেকে শ্রীনগরে পৌঁছে দীর্ঘকাল পর এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল। সংযমী জীবনের অনাস্বাদিত কারণসুধা পান করার বাসনাও জেগেছিল ; দেবারতি নিবৃত্ত করেছে।
কাশ্মীর নাকি ভূ-স্বর্গ। শ্রীনগরে সন্ধ্যা নামে আটটায়। সন্ধ্যার আবীর রাঙানো আকাশ। ঝিলমের জলে সারি সারি চিনার গাছের ছায়া। চারদিকে ফুল জল সবুজের সমারোহ। দূরে ধূসর নিসর্গ। অম্বরীশের পাশে ছিল দেবারতি। দু'জনের চোখের তারায় ছিল ফুল ফোটানোর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে উভয়ের নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে ঢেউ খেলে গিয়েছিল।
নারীতো শস্যক্ষেত। বীজ পড়লে ফুল ফল পাতায় ভরা বৃক্ষ তো হবেই। এতো করুণাময় ঈশ্বরের বিধান। তিনিই পিত্রাদি দ্বারা পুত্রদের জন্ম দিয়ে থাকেন। দৈব প্রজননে ঈশ্বরপুত্র নয়, মনুষ্যপুত্র কামনায় দেবারতি স্বর্গতীর্থে গিয়েছিল ; এবং ঈশ্বরের বিধানেই শেষ পর্যন্ত সেই যুগল প্রেমী ইচ্ছাকৃত স্বর্গচ্যুত হয়েছিল।

প্রকৃতি পরিচয়

সামনে ভরা-যৌবন দামোদর নদী। পিছনে অরণ্যময় পাহাড়। পাহাড়ের গায় ছোট্ট আঁচিলের মত বাংলোটা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সাজানো দাবার ঘুঁটির মত ছোট ছোট অরণ্য-দ্বীপ ইতস্ততঃ। দামোদরের লালচে জল। এখান থেকে পাকা সড়ক অনেক দূরে। দিনে তিন চারখানা দূরপাল্লার বাস যাতায়াত করে। স্টপেজ নেই ; কিন্তু হাত তুললে দাঁড়ায়। বেশ খানিকটা পথ চড়াই উতরাই করে তবে এখানে পেঁছানো যায়। ধারে কাছে জনবসতি নেই। জনমানবহীন নির্জন নিস্তব্ধতা সর্বক্ষণ ছেয়ে থাকে।

হঠাৎ দোলার চিঠি পেয়ে স্টেশনে গিয়েছিল নির্মাল্য। এখানে আসতে গেলে রেলপথই কাছে। দোলাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। ফরেস্ট বিভাগের গাড়ির ব্যবস্থা করে।

গাড়ি থেকে নেমেই নির্মাল্য, জিগ্যেস করল 'কেমন লাগছে দোলা—জায়গাটা ?'

'দারুণ'। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল দোলা।

'স্বপ্নের মত সুন্দর। কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম করছে। তোমার ভয় করে না নিমু ?'

'কীসের ভয় ! কাছেই নিচে পাহাড়ের ঢালে কুঠিতে চারজন ফরেস্ট গার্ড থাকে ! মালী আছে একজন। তাছাড়া পিওন রঘুনন্দন তো ছায়ার মত সর্বক্ষণ সঙ্গেই থাকে। ঘরণীর মত ঘরের সব কাজকর্ম করে দেয়।'

'তবু নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হয়।'

'কষ্ট বলতে একটাই।'

'কী সেটা ?'

'তোমাকে ছেড়ে একা এভাবে এতদূরে থাকা। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে। প্রকৃতি পরিবেশই বোধহয় দায়ী সেজন্যে।'

'তাইতো হঠাৎ চলে এলাম তোমার কাছে। কষ্টটা বুঝতে পারি বলে। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, বেশি বাড়াবাড়ি করা চলবে না কোনমতে।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে ?'

‘অবিশ্বাস করলে একা আসতাম এভাবে ?’

নির্মাল্য কোন উত্তর খুঁজে পেল না। সত্যিই তো তাই। ভালবাসায় কীই না হয়। ভীষণ বেপরোয়া সাহসী করে তোলে।

‘কী বলে বেরিয়েছো হস্টেল থেকে ?’

‘বাড়ি যাচ্ছি।’

‘তুমি আমার চেয়েও সাহসী। বেশি ভালোবাসো বলে।’

দোলাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়ালো। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো। পেলমেট-পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। বেডরুম বৈঠকখানা অফিস ঘর দেখাল। উঁকি দিয়ে বাথরুম ব্যবস্থা দেখল দোলা। জলের ব্যবস্থা পরখ করল সবার আগে। রঘুনন্দন ছোট ভি আই পি অ্যাটাচিটা এনে রাখল। কাচের জানলাগুলো খুলে দিল। ভারি পর্দাগুলো সরিয়ে দিল একে একে।

‘দুপুরে কি খাবেন দিদিমণি ?’

‘তোমার যা মন চায় রেঁধে খাওয়াও।’

জানলা দিয়ে নরম আলো বাতাস আসছিল। বুক ভরে বাতাস নিয়ে এক ঝলক হাসি ছড়ালো দোলা।

‘দারুণ এক কাপ চা খাওয়াও তো আগে। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।’

রঘুনন্দন চলে যেতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল দোলা। শিয়রের কাছে খোলা জানলা দিয়ে পিছনের পাহাড়ের দিকে তাকাল।

‘পাহাড়ের ওই টিলাটায় ওঠা যায় ?’

‘হ্যাঁ। বাংলোর সীমানায় ঢুকতে যে গেট দেখলে ওর পাশ দিয়ে রাস্তা আছে। সোজা ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা। যাবে তুমি ?’

‘যাব।’

সকাল থেকেই আকাশটা আলো আঁধারি। টুকরো টুকরো উদ্‌ভ্রান্ত মেঘ উদ্দেশ্যহীন উড়ছে। সূর্য ঢাকা মেঘছায়া নদীর জলে বিন্দু বিন্দু রেখা এঁকে তরতরিয়ে যাচ্ছে। দুধের সরের মত পাতলা আস্তরণ রচনা করছে। আবার থমকে দাঁড়াচ্ছে।

চায়ের পাট চুকিয়ে পোশাক পালটালো দোলা। ঝুল বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। এলেমেলো হাওয়ায় কপালের ওপর কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। ফিকে নীল ব্লাউজ শাড়ি পরেছে দোলা। উজ্জ্বল দু'চোখে প্রশান্ত বিস্ময়। উন্মুখ চোখ চেয়ে দূর দূরান্তে তাকাল। অনুভব উপলব্ধির গভীরতায় ডুবে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ নিথর। নির্জন নিশ্চুপ। কিছু অজানা পাখির কিচিরমিচির

শব্দ। একটানা ঘুঘুর ডাক। মাঝে মধ্যে টিয়া পাখির ট্যা ট্যা শব্দ। ধান ক্ষেত থেকে উড়ে যাচ্ছে পাখিগুলি। আল বেঁধে বৃষ্টি জমানো ধান ক্ষেত। নবীন গাছে বাদলা হাওয়ার হিল্লোল। আকাশের গা ঘেঁষে সারিবদ্ধ এক ঝাঁক সাদা বক দুরান্তে মিলিয়ে গেল।

'এখন যাবে দোলা ?' নির্মাল্য জিগ্যেস করল।

'কোথায় ?'

'পিছনে ওই পাহাড়ের টিলায়।'

'যাব।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দোলা। বলল, 'দাঁড়াও একটু ভেতর থেকে আসছি।'

বাংলোর সামনে ছোট্ট লন। লনের শেষ প্রান্তে পাহাড়টা ঢল হয়ে নিচে নেমে গেছে। সেই প্রান্ত সীমায় টেকোমা গুঁড়ি গুঁড়ি গাছের বেড়া। বাংলোর চারদিকে হাজার রকমের গাছ গাছালি। পাতাবাহার, ঝাউ, পাথরকুচি, ইরার্কাথিমাম, ক্যাকটাস—আরও কত কী যে ! বারান্দায় টবে সাজানো একোয়াচাইকোটিস, স্কালডিয়াম, ঘৃতকুমারী এবং লজ্জাবতী গাছ। নুড়ি বিছানো রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ফুটন্ত নাইন-ও-ক্লক ফুল। সবুজ ঘাসের কার্পেটে বিশল্যকরণী গাছের আলপনা আঁকা। ছাদ বরাবর একটা বোগনভেলিয়া গাছ। উজ্জ্বল বর্ণ বাবড়ি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে। বকুল গাছে ফুল ফুটেছে অজস্র। টুপটুপ ঝরে পড়ছে। জবা করবী এবং কাঠগোলাপের ছড়াছড়ি।

ওরা দুজনে লন পেরিয়ে নুড়ি পথ এবং নুড়ি পথ থেকে গেটের বাইরে হাঁটুরে পাথুরে পথ ধরল। আঁকাবাঁকা খাড়াই পথ। ঘন ঝোপ জঙ্গল গাছের সারির আঁচলে মুখ লুকনো। নির্মাল্য হাঁটছিল কিছুটা দ্রুত। দোলা পিছিয়ে পড়তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ওর জন্য। হাত ধরে ওপরে উঠতে সাহায্য করল। তারপর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটতে থাকল।

পাহাড়ের দেহময় জিওল, বনশিরীষ, শাল, পিয়ালের সারি। বকুল, আমলকি, হরীতকী, বহড়া বন। কার্কট, নারাঙ্গা, কেন্দু গাছের গলা জড়াজড়ি। আতমোড়া ভেলা সেঁওকুল—আরও কত কী যে গাছ। অনেক অচেনা নাম না-জানা গাছ। নানা লতাপাতা গাছ গাছালিতে ভরা ঘন ঝোপ জঙ্গল। ডালে ডালে কাঠবিড়ালী। বনমুরগি উড়ে গেল একটা।

'ভয় করছে দোলা ?' নির্মাল্য জিগ্যেস করল।

দোলার হাত ধরল। নির্মাল্যর অন্য হাত দোলার কোমরে।

নির্মাল্যর শরীরের সঙ্গে লেপটে থেকে দোলা বলল, 'যদি বাঘ বেরোয় ?'

'ধ্যেৎ। এসব বনে বাঘ থাকে কখনও ?'
'তবু ভয় করছে। চলো ফিরে যাই। অনেকটা উঠে এসেছি। কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।'
দৃষ্টি বুলিয়ে নির্মাল্য দেখল, কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে দোলার। মুক্তো বিন্দুর মত ঘাম। দোলা রীতিমত হাঁপাচ্ছে। বুকের কাপড়ে তরঙ্গ উঠছে।
পাথরের একটা বড় চাঁই দেখিয়ে নির্মাল্য বলল, 'চলো বসা যাক। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর নামা যাবে।'
দু'জনে পাশাপাশি বসল। নির্মাল্যর ডান হাত দোলার মসৃণ কাঁধে। মৃদু চাপ দিল। বামহাতের মুঠোয় দোলার সরু আঙুলগুলো নিয়ে খেলছিল। কিছুটা ঝুঁকে নির্মাল্যর বুকে মাথা রাখল দোলা। তৃপ্তির শ্বাস ফেলল ঘন ঘন। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একে অপরের প্রাণস্পন্দন অনুভব করছিল। একসময় রোমকূপ ত্বকে চমক লাগল। দুলন্ত ডালপাতার ফাঁকে ছলকে পড়া রোদ্দুর। ছোট্ট পাখিদের চঞ্চল পাখনা ওড়া শব্দ। কিচির-মিচির ডাক।
'দোলা'—নির্মাল্য প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল।
'উঃ।'
'কি ভাবছ ?'
'কিচ্ছু না।'
'ভয় করছে ?'
'হ্যাঁ।'
'কীসের ভয় ?'
'জানি না।'
আবার দু'জনে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ অরণ্যে সাড়া জাগিয়ে বৃষ্টি এলো। হরিণ-ছাঁট বৃষ্টি। দুজনে অল্পবিস্তর ভিজল। কপাল গড়িয়ে জলের ফোঁটা ঝরছিল। পাতায় পাতায় শব্দ তোলা বৃষ্টি।
'কী মিষ্টি শব্দ।' নির্মাল্য বলল।
'বৃষ্টি তোমার ভাল লাগে ?' অস্ফুটস্বরে দোলা জিগ্যেস করল।
'হ্যাঁ। তোমার ভাল লাগে না ?'
'জানি না।'
'জানো, বলবে না। আচ্ছা দোলা, এই যে নিরিবিলি নির্জনতায় শুধু আমরা দু'জনে। বৃষ্টিতে ভিজছি। তোমার শরীর মনে বিশেষ কোন অনুভূতির

সাড়া পাও না ? আমি কিন্তু পাচ্ছি ।'

দোলা কোন জবাব দিল না। হঠাৎই উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি থেমে যেতে ব্যস্ততা দেখাল।

'চলো ফিরে যাই। ভীষণ ভয় করছে আমার।'

'কীসের ভয় ?'

কথাটা জিগ্যেস করতে গিয়ে চমকে থমকে গেল নির্মাল্য।

সামনে ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে জ্বলজ্বল জ্বলন্ত দু'টো চোখ এদিকেই তাকিয়ে আছে। পাকা জাম-রঙা একজন আদিবাসী লোক দাঁড়িয়ে। শক্ত খাটো চেহারা। মাথা ভরা কুচকুচে কালো বাবড়ি চুল। কাঁধে একগুচ্ছ জ্বালানি কাঠ। কালো বেড়ালের মত তীক্ষ্ন চোখ দু'টোয় দুর্বোধ্য ভাষা।

নির্মাল্য ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। দোলার হাত ধরে দ্রুত নিচে নেমে এলো।

'কী করবে দোলা—বেরুবে না ঘুমোবে ?'

দুপুরে খাওয়ার পর নির্মাল্য জিগ্যেস করল।

'কোথায় যাবার কথা বলছো ?'

'সামনে ওই নদীর উপত্যকায়।'

'যাব। তবে একটু গড়িয়ে নিয়ে তারপর।'

বিছানায় গড়িয়ে নিতে দোলা সত্যিই ভেতরে চলে গেল। নির্মাল্য ঝুল বারান্দায় বসল। মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। রৌদ্রছায়া কখনও বা ছায়ারৌদ্র খেলা। অরণ্য আকাশ গাছ-গাছালি এবং সামনে নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি হাসছে খেলছে। সামনের লনে ফুল বাগিচায় বর্ণময় হরেকরকম ফুল। নকশা-কাটা ঘাস-ফড়িং প্রজাপতি। দলছুট বন মৌমাছি। চঞ্চল উচ্ছল উড়ে বেড়াচ্ছে। চারদিক মৌ মৌ গন্ধে ভরপুর। যেন কোন উৎসব।

দোলার শরীরের গন্ধে নির্মাল্য চোখ ফেরাল। কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দোলা। চোখে অতল সমুদ্রের আহ্বান। ফড়িং প্রজাপতি বন মৌমাছির উচ্ছলতা। মৌ মৌ ফুলের গন্ধ। দোলার দেহের নিটোল গড়ন। অবিন্যস্ত চুলের অরণ্য। আগোছালো আঁচল। গালে গোলাপী রক্ত স্বপ্নালু। কী লুকনো আছে দোলার মনে ! গভীর অরণ্যে কী লুকনো থাকে ? দোলাকে অরণ্যের মত ভাবতে ভাল লাগল। দু'হাতে বাধাগুলো সরিয়ে সরিয়ে অনেক গভীরে চলে গেলে কেমন হয়। কী অপরূপ সৌন্দর্য লুকনো আছে সেখানে। মোহময় গন্ধবর্ণ রূপরসের ভাণ্ডার ? নির্মাল্যর জানতে ইচ্ছে করল।

'কী দেখছো অমন করে ?'

দোলার ঠোঁটে চাপা হাসি। অর্থবহ।
'তোমার ভেতরটা ভাবতে ভাল লাগছে। ডুব দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।'
'অসভ্য'।
লাজুক চোখে ফিক করে হাসল দোলা। দুষ্টুমিতে ভরা। যেন সোনা ঝরা উজ্জ্বল রোদ্দুর। দোলার শরীরের প্রতিটি স্তর এখন অপার সৌন্দর্যময়। এত মিষ্টি শান্ত সুন্দর সৌন্দর্য নির্মাল্য আগে কখনও দেখেনি। 'অসভ্য' কথাটায় কী যে গভীর ভালবাসা মাখা।
আমি নির্ঘাৎ মরে যাব দোলা। বুকে হাত রেখে দেখ—কী দ্রুত স্পন্দন।'
'ওরকম হয়। বিশেষ করে নিরিবিলিতে।'
অর্থাৎ দোলারও নিশ্চয়ই হয়। নির্মাল্য ভাবল। দোলার বুকে হাত রাখতে এবং গাঢ় আলিঙ্গনে দু'জনের স্পন্দন মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল। এক আর এক মিলে তো দুই সব ক্ষেত্রেই নয়। কখনও সখনও একও হয়। সেই সময়টা কখন? দোলার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার সময়টা!
'নদীর উপত্যকায় যাবে না?' দোলা জিগ্যেস করল।
বন থেকে বনান্তরে নিয়ে যাবার আহ্বান শুনে নির্মাল্য ঝটিতি উঠে দাঁড়াল।
পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে দু'জনে পা ফেলছিল। ক্রমশ নিচে নেমে প্রায় জলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। সোনালি বালির বেলাভূমি। নরম বালিতে সারিবদ্ধ দু'জোড়া পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে। কখনও নদীর কিনারে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছিল।
আকাশে মেঘ সরে গিয়ে নীল চাঁদোয়া ভেসে উঠেছে। ঘাসপাতায় জমে থাকা বৃষ্টি-জলে চকমকি মুক্তো বিন্দু। নদীর জলে পা ডুবিয়ে দু'টো গাছ দাঁড়িয়ে। দিগন্তব্যাপী শীতল নিস্তব্ধতা। এলোমেলো হাওয়ায় দোলার আঁচল খসে পড়ল। ভরাট যৌবন কোনও শাসন মানতে চাইছে না। বকেদের উড়াল দেখে শিশুদের মত ছুটতে, পাখিদের মত উড়তে ইচ্ছে হল।
নদীর কিনারে জল ছুঁয়ে বিরাট বড় একটা পাথরের চাঁই। পাথরটায় পা দুলিয়ে দু'জনে বসল। জল ছুঁই ছুঁই পা। দোলা পা তুলে হাঁটুতে চিবুক পেতে বসল। দোলার নরম দেহের আকর্ষণীয় স্থানসমূহ ছুঁই ছুঁই করেও নির্মাল্য স্পর্শ করল না।
নদীর ওপারে দুগ্ধ ধবল একপাল গরুবাছুর। ছোট একটা ছেলে। উদোম গা। হাতে ছোট্ট একটা কঞ্চি। শিমুল গাছের নিচে বসে আছে ছেলেটা। কিশোর বাছুরটা মনের সুখে লাফাচ্ছে। গলার ছোট্ট ঘণ্টিটায় টুং টাং শব্দ। নিস্তব্ধতা আর নৈঃশব্দ্যের চরাচর। কোঁচড়ে জমানো নুড়িগুলো টুকটাক জলে

ছুঁড়ে ফেলছে দোলা। শব্দ হচ্ছে টুপটুপ। ভারি মিষ্টি শব্দ।
দোলার মাথার চুলে নাক ডোবাল নির্মাল্য। হাতের মুঠোয় হাত। অব্যক্ত অনুভূতি। শরীরময় অনুরণন। রমণীয় রক্তপ্রবাহ। দ্রুত হৃদস্পন্দন। দুরন্ত বেগে সময় বয়ে যাচ্ছিল। সূর্য কখন পশ্চিমে অস্তাচলে। সূর্য ডুবল। রক্ত রেশ মিলিয়ে গেল। পাতলা অন্ধকার নামল। কুয়াশার মত সন্ধ্যার ম্লান আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ল। অরণ্যের বর্ণ বদলাচ্ছে। গাঢ় সবুজ থেকে ফিকে সবুজ। আবার গাঢ় সবুজ প্রকট হয়ে উঠল। তারপর অন্ধকারের গভীরে পাহাড় অরণ্য নদী উপত্যকা যেন ঘুমন্ত। চারদিক রোমাঞ্চকর রমণীয়।
'তোমার ভয় করছে না নিমু?'
'কীসের ভয়?'
'এই নিরিবিলি নির্জন অন্ধকারে—'
কথাটা শেষ করতে পারল না দোলা। ভয়ে চমকে আর্ত চিৎকার করে উঠল।
'ওই দেখ সকালের সেই লোকটা।'
ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সেই আদিবাসী লোকটা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুৎসিত লাগছে। শিকারী জন্তুর মত চাহনি। ঠোঁটে অব্যক্ত দুর্বোধ্য ভাষা। হাতে তীর ধনুক। কাঁধে ঝোলানো ঝুলি। হয়তো খরগোস বনমুরগি শিকার করে ফিরছে।
নির্মাল্যর চোখে চোখ পড়তে লোকটা অপ্রস্তুত। নিমেষে আকন্দ কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের আড়ালে উধাও। দোলা চকিতে অরণ্য উপত্যকা পেরিয়ে হরিণীর মত ছুটতে থাকে। অতি দ্রুত ঊর্ধ্বশ্বাসে। নির্মাল্য পিছনে দৌড়ে গেল। কিছুতেই ধরতে পারল না।
বাংলোয় ফিরে নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় আছড়ে পড়ল দোলা। উবু হয়ে ভাঁজ করা পা নাচালো। কাঁচের চুড়ির শব্দ ছড়ালো। মুঠো মুঠো ঢেউ তোলা হাসি ওড়ালো। বুকের কাপড় অবিন্যস্ত। মাথার চুল এলোমেলো। ঠোঁটের পাপড়িতে থরথর কাঁপন।
'ভয় করছে দোলা? এখানে আবার কীসের ভয়!'
দোলা কোন জবাব দিল না। চোখের মণিতে স্থির বিস্ময়। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ নদী পাহাড় অরণ্য উপত্যকা—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে প্রকৃতিকে ঠিকঠাক চেনা যায় না। চার দেয়ালের ভেতর বুকের ওপর নির্মাল্যকেও নয়। এখন দরজার অর্গল বন্ধ। সিঁড়ি বারান্দায় গ্রিল আঁটা। দোলা জানে, সেই লোকটা কিছুতেই এখানে আসতে পারবে না। অথচ, তার চোখ দুটো নির্মাল্যর চোখে স্পষ্টত।

মণিকরণ

সর্বপ্রথম সুকিরণ বলল, কুলু এসে মণিকরণ যাব না এ হতেই পারে না। পরে মণিকা এবং সুকেশও সায় দিল। একা রমেন্দ্র চুপচাপ। সে কার কাছে শুনেছে, মণিকরণের পথ দারুণ দুর্গম এবং অবিশ্বাস্য মরণ ফাঁদ পাতা। সেজন্য ভাবছিল, নিশিদিন কুলু উপত্যকার বর্ণাঢ্য দশেরা উৎসব মেলা দেখে সময় কাটানো ঢের ভাল। বিপাশা নদীর চপল প্রবাহ ধ্বনিটাও এখান থেকে বেশ শ্রুতিমধুর। মণিকরণ যাওয়া মানেই ফালতু ঝুটঝামেলা।

সুকেশ মন্তব্য জুড়ল, রমেন্দ্রকে নিয়ে যত সমস্যা। বড্ড ভীতু। কেমন করে যে পাঞ্জাবী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করল সেটাই অবাক কাণ্ড।

সুকিরণ শুধরে দিয়ে বলল, ভুল কথা। আমিই রমেনকে বিয়ে করেছি। খাঁটি বাঙালী রমেনকে।

রমেন্দ্র কোন আপত্তি জানাল না। অত্যন্ত শান্ত নম্র প্রকৃতির নির্বিরোধ ভাল-মানুষ। সুকিরণের কথায় নিরুত্তাপ নিরুচ্চার লাজুক হাসল। বলল, সুকিরণ আমাকে কিরণ দেয়। ও সঙ্গে থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয়ডর থাকে না। চল, আমিও যেতে রাজি।

কুলু থেকে ভুন্তর—দূরত্ব নয় কিলোমিটার। বাসে মিনিট কুড়ি লাগে। বিপাশা নদীর সমান্তরাল পাকা মসৃণ পথ। দুধারে আপেল বাগান। পশমের কারখানা। বর্ণালী পাহাড়ি ফুল এবং কিছু চাষআবাদের জমি। লাকসারী বাসে বসে এতসব দেখতে দেখতে এত যে উৎসাহ উল্লাস উচ্ছ্বাস—তার কিছুটা ভাঁটা পড়ল ভুন্তর এসে। একটু আগেও কেউ জানত না, ভুন্তর থেকে মাত্র চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে মণিকরণ যেতে কমপক্ষে সময় লাগবে তিন ঘন্টা। জানল, ভুন্তর এসে।

বিপাশা নদীর ওপর ঝুলন্ত কাঠের ব্রীজ। পায়ে হেঁটে পার হলে ছোট-খাটো একটা বাজার। বাঁয়ে বাঁক নিলে ভুঁই। এখান থেকে মণিকরণের বাস ছাড়ে।

পুরনো মডেলের ছোট একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধভগ্ন বিধ্বস্ত দেহ।

রমেন্দ্র টিকিট বুকিং-এ গিয়েছিল। ঝটিতি ফিরে এল। কাঁচুমাচু চোখ চেয়ে জানাল, শুনলাম একদম কাঁচা রদ্দি রাস্তা। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। বাস থেকে নেমে এক মাইল পায়ে হাঁটা পথ। এমনিতে রোজ দু'টো বাস যাতায়াত করে। তার একটা দু'দিন হল ব্রেকডাউন। এখন সামনের ওই সবেধন নীলমণিটি দিনভোর যাচ্ছেন আসছেন। সুতরাং, একটু ভেবে দেখা দরকার।

সুকেশ একটু ভয় পেয়ে প্রশ্ন তুলল, হঠাৎ যদি নীলমণিটিও মাঝপথে বিগড়ে যায় তাহলে ?

রমেন্দ্র শুনে খুশী হল। আগেভাগে ভয় দেখাল, ব্যাস তখন আর ফেরার কোন উপায় থাকবে না।

সুকিরণ ভরসা দিল, ওখানে শিখদের গুরুদ্বার আছে। ফ্রি থাকা খাওয়া। দারুণ মজা হবে।

রমেন্দ্র চুপসে গেল। স্পষ্টত বুঝতে পারল, না গিয়ে নিস্তার নেই। নিস্তার পাবার আশাতেই টিকিট না-কেটে ফিরে এসেছিল। সুতরাং, সুকিরণ টিকিট সম্পর্কে কিছু বলার আগেই বুকিং কাউন্টারের দিকে ছুটল।

একটা ডবল সীটে মণিকা আর সুকেশ পাশাপাশি বসেছে। সুকিরণ জায়গা রেখেছিল। রমেন্দ্র পাশে বসল। পিছনের সীটে কোণের দিকে দক্ষিণ ভারতীয় এক দম্পতি বসেছে। চারজন হিপি উঠেছে। বাকি সকলেই হিমাচল প্রদেশের পাহাড়িয়া মানুষজন। অনেকেরই রক্তবর্ণ ঢুল ঢুল চোখ। সম্ভবত ছ্যাং খেয়ে রাতভোর দশেরা মেলায় নাচগান আমোদ ফুর্তি করেছে।

ড্রাইভারের পিছন সীটে পাহাড়ি এক সুন্দরী বসেছে। ঠিক মণিকার মুখোমুখি। ঠোঁটে আলতো হাসি। নিষ্পাপ চোখ মুখ চাহনি। ভারি মিষ্টি দেখতে। মণিকা একটু ঝুঁকে সুকেশের কানের কাছে মুখ নিল। আস্তে জিজ্ঞেস করল, ওদের নাকি পাঁচ সাতটা স্বামী থাকে। এক ফ্যামিলির সব ভাই—এরাই স্বামী হয়ে যায় ?

সুকেশ ধমকের সুরে বলল, ধ্যেৎ। এসব আজগুবী খবর তুমি কোত্থেকে জোগাড় করলে।

মণিকা ধমকে না দমে দৃঢ়তার সঙ্গেই মুখ তুলে বলল, কোন একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম—ঠিক মনে নেই। অবশ্য যদি হিমাচল প্রদেশের সেই সম্প্রদায়ের হয় তবেই।

সুকেশ অবাক হল। পত্রিকায় পড়েছে শুনে বলল, আমি ঠিক জানি না। সত্যি হলে ব্যাপারটা খুব মজার বটে।

পিছন সীট থেকে রমেন্দ্র এতক্ষণ আড়ি পেতে সব শুনছিল। মুখ ফসকে

মন্তব্য জুড়ল, পঞ্চ পাণ্ডবদের প্রভাব আছে ধরে নিতে হবে।
বাস চলছে দুলকি চালে। তার সর্বাঙ্গে যেন অর্কেস্ট্রা বাজছে।
ক্রমশ বিপাশা অনেক পিছনে পড়ে থাকছে। এখন বাঁয়ে পার্বতী নদী। টলমল গাঢ় সবুজ জল। স্বচ্ছ সফেন উচ্ছল। পাথরের স্তূপে স্তূপে লটকে থাকা ভাসন্ত কাঠ। কখনো দুর্বার স্রোত। মিষ্টি কলকল কলতান। যৌবন ঝলসানো হাসিচ্ছটা! খোলা আকাশ। আকাশ ছোঁয়া সারি সারি বিশাল ঝাউ পাইন গাছ। কখনো বিস্তীর্ণ নদীর উপত্যকা। শস্যক্ষেত আপেল বাগান। আখরোট বাদাম ভূর্জপত্র গাছ। সবুজ পাহাড় অরণ্য।
সুকিরণ রমেন্দ্রর কাঁধে মাথা রাখল। সুকেশের মুঠিতে মণিকার আঙুলগুলো খেলা করছে। বাস চলছিল বিশ্বস্ত পদাতিকের মত নির্ভুল অতিসন্তর্পণে। ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলেই গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া নির্মম নিয়তি অনিবার্য। পাহাড়ের গা কেটে গড়া এখনো অসম্পূর্ণ কাঁচা রাস্তা। সরু এবং অসমতল। ঘন ঘন গিয়ার পাল্টাচ্ছে ড্রাইভার। বেজায় ঝাঁকুনি হচ্ছে। সুকেশ —মণিকা এবং সুকিরণ—রমেন্দ্র ক্রমশ বেশিরকম ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। রমেন্দ্র নিচুস্বরে ফোড়ন কাটে, কুলু এসে মণিকরণ যাব না—এ হতেই পারে না। সুকেশ সুর মেলায়, এ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। মণিকা এবং সুকিরণ ভীষণ চুপচাপ। ভয়ে জুবুথুবু। কেউ কোন জবাব দেয় না।
খুব সরু একটা বাঁকে ড্রাইভার বাস থামাল। পায়ে হেঁটে পরবর্তী পথ পর্যবেক্ষণ করে এলো। আবার চালাতে থাকল।
ঝাড়ি-তে সাময়িক বিরতি। ড্রাইভার চা খেতে গেল।
সামনেই কাঠ পাথরে তৈরি ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। রমেন্দ্র এবং মণিকা চা খেতে বসল। সুকেশেরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা দেখে রুচি হল না। সুকিরণ চা খায় না। সে ততক্ষণে আপেল বাগানে। শিশু চাপল্যে ডালে হাত বাড়িয়ে কোঁচড়ে আপেল ভরছিল।
সুকিরণ হঠাৎ থমকে গেল। সুকেশ তার নাম ধরে ডাকছে। ঝোপের এপার থেকে ঢাল জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সুকেশকে দেখা যাচ্ছে না। সুকিরণ চাপা স্বরে জানান দিল, আমি এদিকে। সুকেশ এক দৌড়ে সুকিরণের কাছে এসে দাঁড়াল।
একটা আপেল দাঁতে কেটে সুকিরণ খুশির শব্দ তুলল, হুম। সুকেশকে উদ্দেশ্য করে বলল, গোল্ডেন আপেল। দারুণ মিষ্টি—খাবেন একটা? সুকেশ হাত বাড়িয়ে কোঁচড় থেকে পছন্দমত একটা আপেল নিল। তারপর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, ওদিকে পালিয়ে চল। এভাবে এত আপেল তোলা

তোমার উচিত হয়নি। না-বলে পরের দ্রব্য নিলে কি হয় জানো ?
সুকেশের হাতে চিমটি কেটে সুকিরণ জবাব দিল, এবং সেই দ্রব্যে ভাগ বসালে কি হয় শুনি।
দু'জনে পাশাপাশি দ্রুত হাঁটছিল। সুকেশ কোন জবাব দিতে পারল না।
সুকিরণ বলল, চুরি করে খাওয়ায় দারুণ আনন্দ। খেয়েছেন কোনদিন ?
সুকেশ অন্যভাবে নিল। বলল, ইচ্ছে তো হয়। কিন্তু ভয় করে।
—কাওয়ার্ড। সুকিরণ বলল, রমেন আপনার চেয়ে ঢের বেশি সাহসী।
দু'জনে পায়ে পায়ে শস্যক্ষেত ছাড়িয়ে যায়। প্রায় নদীর কাছাকাছি চলে আসে। দূরে ছোট্ট একটা কুটিরের চালে স্বর্ণালী ঝলক দেখে সুকিরণ অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, ছাদটা ওরকম সোনালি কেন ?
সুকেশ বলল, ভুট্টা শুকোতে দিয়েছে তার রঙ। এখানে শীতের আগেই সব শস্য ঘরে ওঠে যায়। শীতে এসব জায়গা সম্পূর্ণ বরফ ঢাকা থাকে। ঘরের বাইরে বের হবার উপায় থাকে না। তাই শীতের আগেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সদর থেকে আনিয়ে রাখে।
—বুঝেছি। অর্থাৎ, বর্ষার আগে গ্রাম বাংলার লোকেদের প্রস্তুতির মত তাই না ?
সুকেশ অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, গ্রাম বাংলার লোকদের কথা তুমি জানলে কেমন করে ?
—ছোটবেলা থেকেই বাংলায় মানুষ যে। বাঙালীই তো হয়ে গেছি।
সুকিরণ বর্ণময় একটা পাহাড়ি ফুল সুকেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি অনেক দেশ দেখেছেন তাই না ?
সুকেশ সংশোধন করে দিল, না। স্বদেশেরই কিছু কিছু জায়গায় ঘুরেছি। বেড়াতে আমার দারুণ ভাল লাগে। বিয়ের পর থেকে তেমন বেড়ানো হয়ে ওঠে না।
—কেন ?
—আমাদের শাস্ত্রে আছে, পথে নারী বিবর্জিতা। আমার মনে হয়, বেড়াতে বেরিয়ে নারী বিরাট একটা বোঝা।
—বাজে কথা। আমাকে দেখে কী তাই মনে হয় ?
—তুমি দারুণ স্মার্ট। তুমি হলে তো কোন সমস্যাই থাকত না।
—আপনার বউকে বলে দেব। সুকিরণ খিলখিল করে হেসে উঠল।
বাসের হর্ন শুনে সুকেশ বলল, আমাদেরকে ডাকছে বোধহয়।
বাসটা এখন ফাঁকা ফাঁকা। সুতরাং, জানলার ভাঙা কাঁচ আর টিনের

জোড়াতালির ঝনঝনানি আরো তীব্র হয়ে উঠল। একজন পাহাড়ি পুরুষ পা ছড়িয়ে গান ধরল। মিষ্টি সুর, মধুর কণ্ঠ। শুনতে বেশ ভাল লাগছে। পাহাড়ি ভাষায় গান। সুতরাং গানের অর্থটা বোঝা যাচ্ছে না। সুকেশের জানতে ইচ্ছে হল।

গান থামাতে সুকেশ একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে গায়কের সঙ্গে ভাব জমাল। গায়কের নাম রাগনাথ। অল্প সল্প হিন্দি জানে। থাকে মণিকরণ গ্রামে। মণ্ডিতে কাজ করে। অনেকদিন পর গ্রামে ফিরছে। তাই আনন্দে এতক্ষণ গাইছিল, 'তুমি সেই কবে থেকে পথ চেয়ে আছো প্রিয়ে। আর একটু ধৈর্য ধরো, এই তো আমি এলাম বলে।'

রাগনাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাঁহাসে আঁয়ে হ্যায় ?

সুকেশ বলল, কলকাতা। কলকাতা কা নাম শুনেহো কভি ?

রাগনাথ কলকাতার নাম শোনেনি। এমনকি সিমলা পর্যন্ত কোনদিন যায়নি। তার দৌড় মণ্ডি পর্যন্ত। সুকেশ কলকাতার হাজারো সুখ মজা স্ফূর্তির বর্ণনা দিয়ে লোভ দেখাল, তুম যাও গে ?

রাগনাথ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। সুকেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিঁউ নাহি ?

—গাঁও ছোড়কে দূরদেশ জানেকো দিল নাহি চাহাতা।

মণিকরণ এসে গেল। আলাপে ছেদ পড়ল। ধুলোয় সর্বশরীর মাখামাখি সকলে যেন শ্মশান সন্ন্যাসী। এবার পায়ে হাঁটা পথ। চারদিক বসতি এবং জনমানুষহীন। শুধু পাহাড় জঙ্গল গাছ গাছালি। নদীর উপত্যকায় শস্যক্ষেত। কয়েক কদম এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতেই পার্বতী নদীর অশান্ত গর্জন ভেসে এল। পাহাড় কাটা অতি সরু পথ। কিছুটা পথ হাঁটার পর বাঁয়ে কাঠের ছোট্ট সেতু। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে মণিকা অতি আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল, ওয়াণ্ডার-ফুল! দারুণ, দারুণ।

দু'টি বিরাট পাথরের চাঁই পার্বতী নদীকে প্রতিরোধে চেষ্টা করে ব্যর্থ। বালখিল্য প্রতিরোধ-ধৃষ্টতায় পার্বতী যেন ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্করী। সফেন শুভ্র দুর্বার স্রোতা। উদ্ধত নাগিনীর মত ফুঁসছে। সব কিছু ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে।

রমেন্দ্র সেতুর ওপর থেকে ছিনিয়ে নেবার মত সুকিরণকে টেনে নিয়ে বলল, পালিয়ে এসো। সেতুটা সুবিধার নয়।

সেতু পেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিলে একটু চড়াই পথ। তারপর কয়েক ধাপ নিচে নামলে মণিকরণের মন্দির। রাগনাথ কোথা থেকে ছুটে এসে মন্দিরের

পথ দেখিয়ে বলল, আইয়ে বাবুজী।

রাগনাথ ঘরে ফেরার আগে মন্দির দর্শন করতে যাচ্ছিল। ওর কাছেই জানা গেল, জায়গাটার আসল নাম হরিহরঘাট। হরিহর নাকি বলে গিয়েছিলেন, সত্য যুগ অন্তে কলিযুগের প্রারম্ভ সময়ে মুনি ঋষি এবং মহাত্মাদের পদার্পণে জায়গাটা পরম প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে।

সুকিরণ বলল, সুমের পর্বত যাবার সময় গুরু নানক এখানে এসেছিলেন। তখন এখানে জনবসতি ছিল না। স্রেফ জঙ্গল ছিল। ভুন্তর থেকে পায়ে হেঁটে আসতে গুরু নানকের সময় লেগেছিল তিন দিন।

পাশ থেকে সাধু শ্রেণীর একজন বলল, বেটিনে ঠিক বলা।

সুকিরণ উৎসাহ পেয়ে গাইড হয়ে গেল। বলে চলল, গুরু নানক তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। প্রধান শিষ্য লক্ষ্য করলেন, একটা পাথরের চাঁই-এর নিচ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্প উঠছে। গুরু নানক শিষ্যের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে বললেন, বৎস ওই পাথর সরিয়ে দেখ, নিচে উষ্ণ জলের কুণ্ড আছে। শিষ্য দেখলেন, ঠিক তাই। গুরু নানক বললেন, এই কুণ্ডস্থল অতি পবিত্রতম স্থান। ভবিষ্যতে পবিত্র মানুষরূপে আমরা আবার এখানে আসব; আর বহুদিন থেকে মানুষজনের সেবা করে যাব।

রাগনাথ কাছে দাঁড়িয়ে বেশ মন দিয়ে শুনছিল। সুকিরণের বক্তব্য কিছুটা অনুমান করতে পেরে আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, নানকজীনে ফির কভি আয়া মাঁজী?

—মালুম নেহী। লেকিন বহুত দিন বাদমে গুরু গোবিন্দ সিং ইহাঁ তীর্থ করনে আয়াথা।

—এ বাত ম্যায়ভী জানতা হুঁ। গোবিন্দজী আনেকা বাদ শিখ লোগকা পবিত্র স্নান বনা দিয়া। অন্দার গুরুদ্বার মে আইয়ে সব পতা চল যায়েগা।

সুকিরণ গুরুদ্বারে ঢুকল। সুকেশের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। এ তল্লাটে কোথাও বিড়ি সিগারেট পায়নি। বিষণ্ণ মনে শিখ মন্দিরের সামনে চুপচাপ বসে পড়ল। রমেন্দ্র এবং মণিকা সন্তবাবার দেয়া ফ্রি চা খেতে বসল। মণিকা একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। সাধুসন্তে তার ভীষণ ভয়। সন্তবাবা অভয় দিয়ে বললেন, ডরনেকা কোই বাত নেহী। আরাম সে পিজিয়ে। সব কষ্ট দূর হো যায়গা। মণিকা হাত নেড়ে ইশারায় সুকেশকে কাছে ডাকল। তিনজনেই কুণ্ডের ফুটন্ত জলে তৈরি করা চা খেল।

ফিরে এসে সুকিরণ বলল, গুরু নানক যেখানে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেই জায়গাটা দেখে এলাম। নিচে ছোট্ট একটা ঘর আছে। সকলে যাবে চল।

ওখানে থাকলে নাকি ব্রঙ্কাইটীজ এ্যাজমা সেরে যায়।
রমেন্দ্র বলল, ওসব রোগ আমাদের কারও নেই। তুমি যাবে যাও।
সুকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাব চল।
শিব মন্দিরের সামনে উষ্ণ প্রস্রবণের সযত্ন সঞ্চিত গরম জলধারা। অলপবয়সী একটা ছেলে অর্ধনগ্ন হয়ে স্নান করছে। হিপি চারজন চাতালে বসে আছে। দক্ষিণ ভারতীয় দম্পতি রামমন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে।
রমেন্দ্র আর মণিকা জলে পা ডুবিয়ে হাত মুখে জল দিল। আরাম বোধ করল। রমেন্দ্র আবৃত্তি করার মত বলে উঠল, হিমালয়ের এই সেই স্থান যেখানে তুষারাবৃত রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে শিবপার্বতী প্রেমলীলা করতেন। কোন একদিন লীলাকালে পার্বতীর চিন্তামণি রত্নটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পাতালে পড়ে যায়। শিব তাঁর তৃতীয় নেত্র মেলে দেখলেন, শেষনাগ তাঁর প্রিয়ার রত্নটি উদরস্থ করেছে। শিবের ক্রোধ হল। চিন্তামণি রত্নসূত্রে নাম হল মণিকরণ।
মণিকা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বলল, এত সুন্দর করে বললেন যে মনে হচ্ছিল, আমি যেন সেই দেবলোকে পৌঁছে গেছি। হাঁটু থেকে মুখ তুলে বলল, শুনেছি এখানকার জলে স্নান করলে নাকি সব রোগ শোক পাপ ধুয়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রান্না গুছিয়ে কুণ্ডের জলে বসিয়ে দিলে রান্না হয়ে যায়। আপনি এসব বিশ্বাস করেন ?
—খুব কঠিন প্রশ্ন। এক কথায় আমার জবাবে বিতর্ক আসবে—কাজেই বলব না। আপনি যে মোটেই বিশ্বাস করেন না তা আমি বুঝতে পারছি।
মণিকা অবাক হল। আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজল। ভাবল, রমেন্দ্র মোটেই সুকেশের মত নয়। সে যেন নিষ্পাপ পবিত্র শিশুর মত। সুকিরণ থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবার নয়—এমন একটি রত্ন বিশেষ। সুকিরণকে মনে মনে হিংসে হল। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল, আমার কী স্নান করা দরকার !
অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রমেন্দ্র বলল, চলুন ওদিকটা ঘুরে দেখা যাক। বড্ড গরম লাগছে।
নদীর দিকটা বাঁধানো মুক্ত বারান্দার মত। এখানে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্যটা পরম বিস্ময়ের। প্রকৃতির অপূর্ব আশ্চর্য লীলা খেলাও বলা চলে। একদিকে শরীর ঝলসে দেবার মত উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। অন্যদিকে নিচে সামান্য দূরত্বে বরফশীতল পার্বতী নদীর জল।
সুকেশ সুকিরণ কখন এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। মন্দির থেকে বহু দূর পর্যন্ত ঝুলন্ত দড়িতে অজস্র রঙীন পতাকা উড়ছে। ভাসন্ত সাদা মেঘের মত আকাশমুখী উষ্ণ বাষ্পরাশি। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সুন্দর বন

গাছগাছালি। ফুল ফল লতা গুল্ম।
রেলিং-এ হাত রাখল সুকিরণ। সুকেশের হাতে হাত স্পর্শ হল। সুকিরণ হাত সরাল না। ধারে কাছে কেউ নেই। সুকেশ জিজ্ঞেস করল, ফিরে গিয়ে আমাকে মনে রাখবে সুকিরণ?
—খু-উ-ব মনে রাখব।
গভীর অরণ্যের অন্ধকার থেকে কি একটা পাহাড়িয়া পাখি ডেকে উঠল। সুকেশের হাত এখন সুকিরণের হাতের ওপর। সুকিরণের রক্তপ্রবাহ দ্রুত হল। শিরশির শরীর কাঁপল। সযত্নে হাতটা সরিয়ে নিল। আপন মনেই বলল, শুনেছি পাণ্ডবেরা এখানে থাকাকালে কোথায় যেন একটা সেতু গড়েছিল। ক্ষীরগঙ্গা নদীর ওপর। সেটা কতদূর?
সুকেশ বলল, অত কী ছাই জানি! দেখতে ভাল লাগে তাই দেখে যাই। আমার দেখাতেই যত আনন্দ।
সুকিরণ চোখ তুলে সুকেশের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। নির্বাক আত্মমগ্ন হয়ে ভাবল, আমি যে শুধু দেখেই খুশী থাকতে পারি না। ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিজের করে না-পেলে অতৃপ্তি থেকে যায়।
সুকিরণ বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। নিষ্পলক মৌন স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমশ আত্মমগ্ন গভীরে তলিয়ে গেল। স্বগতোক্তির মত বারবার বিড়বিড় করল, মা বলেছিলেন—তিরথ আশ্রম···ক্ষীরগঙ্গায় স্নান করলে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়···শঙ্কর কার্তিক পার্বতী···কী সব তপস্যা-পাপ-প্রায়শ্চিত্ত ···কী যেন-সব ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছি না।
মণিকা এবং রমেন্দ্র কাছে এসে দাঁড়াল। সুকিরণের কাঁধে আলতো হাত রেখে রমেন্দ্র ডাকল, কিরণ—
সুকিরণের ঠোঁটের পাপড়ি দুটো কাঠগোলাপের মত। রমেন্দ্রর ডাকে ঈষৎ কেঁপে কেঁপে উঠল। বৃষ্টিভেজা অরণ্য-পাতা চোখ চেয়ে রমেন্দ্রকে বলল, ওই বন পাহাড় পেরিয়ে আমাকে ক্ষীরগঙ্গায় নিয়ে যাবে চল।

সরলরেখা

অনেকদিন হল, প্রিয়ঙ্করের বুকের ভেতর একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সেটা প্রায়ই নড়েচড়ে ওঠে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জ্বালায়। তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলে। সময় সময় সর্ব শরীরে ছড়িয়ে যেতে চায়। প্রিয়ঙ্কর গোপন রোগের মত প্রতিক্রিয়াহীন চুপচাপ সহ্য করে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।

কাঁটাটা রেখে গেছে সুধা—প্রিয়ঙ্করের প্রথমা স্ত্রী। ভালবাসা নামে একটি স্নিগ্ধ সুরভিত সুন্দর ফুল দিয়েছিল সুধা। প্রিয়ঙ্কর অন্তত তাই মনে করত। দারুণ কিছু প্রাপ্তির আনন্দে তাই মোটামুটি খুশিই ছিল। কিন্তু, বিয়ের তের মাস পরে সুধা বিচ্ছেদ নিয়ে চলে যেতে ভুল ভাঙে। এখন বেশ বুঝতে পারে, শুধু ফুল নয়, সঙ্গে একটা দারুণ যন্ত্রণাদায়ক তীক্ষ্ন কাঁটাও লুকনো ছিল—অন্তরালে।

সুধা নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে আগের জীবনে চলে যেতে প্রিয়ঙ্করের স্বপ্ন আশায় টোল খায়। সে যেন গভীর নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। তারপর প্রায় দু'বছর হল সুধাস্মৃতি নিয়ে নিত্য সহবাস; এবং কাঁটাটা তুলে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চলছেই।

কাঁটাটা অবশ্য এখন আর আগেকার মত তেমন করে খোঁচায় না। ততটা জ্বালায় না। ইদানীং প্রিয়ঙ্করের সঙ্গে বেশ এক হয়ে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে আছে। মাঝেমধ্যে নড়েচড়ে ওঠে মাত্র। ঠিক চড়ুই পাখি উড়ে বেড়াবার মত অনুভূতি জাগায়। প্রিয়ঙ্কর তাতে খুব একটা বিব্রতবোধ করে না। কখনো সখনো বড় জোর জ্বরো রুগীর মত অবসাদ বোধ করে। এক আধটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ওড়ায়। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এই যে বিষণ্ণ অবসাদ—এর নাভিমূল কোথায় তা বুঝতে প্রিয়ঙ্করের অসুবিধা হয়নি। সেজন্যই সীমাকে দ্বিতীয়া স্ত্রী করে ঘরে এনেছে। নতুন বিয়ে করে সীমাকে ঘরে আনা তা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা।

সীমা প্রিয়ঙ্করের প্রথম বিয়ের কথা জানে। প্রিয়ঙ্কর ইচ্ছে করেই বিবাহ বিচ্ছেদের

ঘটনাটা লুকোয়নি। সীমার অভিভাবকদের আগেভাগেই জানিয়েছিল। কিন্তু, সুধা-সম্পর্কিত বিস্তৃত যা কিছু সেসব একমাত্র সীমাকেই বলেছে।
প্রিয়ঙ্করের ধারণা, গোপনতায় স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না—না শরীর না সংসারের। সেজন্য সীমাকেও খোলাখুলি সোজা কথা বলেছে, যদি বিয়ের আগেকার তেমন কোন এপিসোড এ্যাফেয়ার থেকেই থাকে, সেসব ঝেড়ে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করো।
প্রথম দিকে প্রিয়ঙ্করের মনেও দ্বিধা সংকোচ সংস্কার ছিল। পরবর্তীকালে পরখ করে দেখতে পেয়েছে, ভালবাসার আপনজনদের কোনদিনই প্রকৃত অর্থে ভুলে থাকা যায় না। ব্যস্ত মন দিয়ে সাময়িক ঢেকে রাখা যায় মাত্র। সময় সুযোগ বুঝে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তারা ঠিক উড়ে এসে উঠোন জুড়ে বসে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সীমাকে বলেছে, সুধা থাক স্মরণে ; আর তুমি থাক দৈনন্দিন জীবনে। দেখবে, কোন অসুবিধাই হবে না।
ভালবাসা সম্পর্কে প্রিয়ঙ্করের একান্ত নিজস্ব কিছু ভাবনাচিন্তা আছে। তার মতে, অহিংস প্রেমে 'ভালবাসতাম' বলে কিছু নেই, সর্বদাই 'ভালবাসি'। যদি অবশ্য ভালবাসার ব্যক্তি বা বস্তুটির গুণগত কোন হেরফের না হয় তবেই। প্রেম প্রণয় ভালবাসা তো অনেক নারী-পুরুষেই হয়। নানা কারণে হয়ত বিয়ে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথবা, বিয়ের পরেও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন বাস্তব হয় না। তাই বলে 'ভালবাসতাম' হবে কেন ? আর, দ্বিতীয় কাউকে ভালবাসতে পারা যাবে না—এটাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়।
এখন ক্লান্ত দিনের শেষে বিশ্রাম প্রত্যাশায় রাতের বিছানায় প্রিয়ঙ্কর শুয়ে আছে। বালিশে নিশ্চিন্ত আরামে মাথা রেখে এসব অনেক কিছুই ভাবছে। ভাবছে ভাঙছে গড়ছে। পাশের বালিশটা এখনো ফাঁকা। সীমা এখনো ভেতর ঘরে কাজ সারছে।
কিছুক্ষণ পরে সীমা ঘরে এলো। দরজায় খিল এঁটে পরনের পোশাক ঢিলেঢালা খোলাখুলি করে হাল্কা হল। তারপর চারদিকে মশারী গুঁজে প্রিয়ঙ্করের পাশে শুয়ে গা এলিয়ে দিল।
এই মুহূর্তটির জন্যই প্রিয়ঙ্কর প্রতীক্ষায় জেগেছিল। মশারীর তলা দিয়ে হাত গলিয়ে আলো নেভাল। তারপর অতি দ্রুত সীমার দেহটাকে কাছে টেনে নিল। দুহাতের বাঁধনে বুকের ভেতর জাপ্টে ধরে সতৃপ্ত শব্দ তুলল, সীমু সোনা। সোনা আমার।
সীমা খুশিমনে সাগ্রহে প্রিয়ঙ্করের ভাঁজ করা শরীরের খোলের ভেতর নিজেকে সঁপে দিল। প্রিয়ঙ্করের বুকের অরণ্যময় উপত্যকায় আলতো আঁচড় কেটে

জিগ্যেস করল, কি ভাবছিলে গো এতক্ষণ—সুধাদির কথা ?
প্রিয়ঙ্কর ঝটিতি কোন জবাব দিতে পারল না। আচমকা বিদ্ধ করা এরকম একটা প্রশ্নে সবিশেষ বিমূঢ় হয়ে গেল। সীমাকে অনাবৃত করল। আরো নিবিড় করে বুকে টেনে নিল। ওর মসৃণ কোমরে হাত রেখে বলল, সত্যিই যদি তা হয়—তুমি রাগ করবে ?
কৃত্রিম ঔদাসীন্য দেখিয়ে সীমা জবাব দিল, আমার রাগ দেখে ভাবনা তো আর তোমাকে ছেড়ে পালাবে না।
প্রিয়ঙ্কর স্পষ্ট বুঝতে পারল, এটা সীমার অভিমানের কথা। বলল, অতীতে তুমিই যদি কাউকে ভালবেসে থাক, আর আজ বিশেষ কোন মুহূর্তে তাকে যদি তোমার মনে পড়ে যায় তাতে আমার ঘাটতি কোথায় ? সেজন্যে হিংসা বা সন্দেহই বা হবে কেন ?
সীমা যেন যাচাই করার সুযোগ পেয়েই বলল, সত্যিই যদি আমার অতীত জীবনের তেমন কোন ঘটনা তোমাকে শোনাই ?
প্রিয়ঙ্কর দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা দিয়ে বলল, বিনা দ্বিধায় শোনাতে পার। দেখবে, একটুকুও রাগ করব না। বরং, অকপটে স্বীকারোক্তিতে খুশিই হব।
সীমা এতক্ষণে নিজেকে বেশ কিছুটা শিথিল করে নিয়েছে। আনমনা হয়ে পড়েছে। সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, আমিও যে শোনাতে না পেরে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। রোজই বলব বলব ভাবি, কিন্তু ভরসা পাই না। ভীষণ ভয় হয়।
কথার ছেদ টেনে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর সীমা আবার বলতে শুরু করল।
একথা সত্যি—বিশেষ কোন অবসর মুহূর্তে কোন একজনকে আমার মনে পড়ে যায়। পরিমিত লম্বা স্বাভাবিক রোগা চেহারায় শান্ত প্রসারিত তার দৃষ্টি। তার নাম দিব্যেন্দু দত্ত। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আর হিসেব করা বাচনভঙ্গী তার। ঠোঁটের কোণে সর্বক্ষণ এক দুর্বোধ্য হাসি লেগে থাকত। তার অযত্ন আগোছালো চুলের কয়েকটি প্রশস্ত কপালের ওপর দিয়ে ভুরু দু'টোর আড়াআড়ি ঠিক চোখের ওপর দোল খেত। পরনে থাকত খদ্দরের ধুতি আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগ। চোখে পুরুষ্টু কালো ফ্রেমের চশমা। সমস্ত শরীরে চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের স্বাক্ষর।
এমন একজনকে আমি ভালবাসতাম। সে আমার দাদার বন্ধু। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয়। দাদার বন্ধুদের মধ্যে দিব্যদা ছিল ব্যতিক্রম। সে ছিল সংগ্রামী উদার। ভাল ছবি আঁকে, আবৃত্তি করে। সাহিত্য সঙ্গীতের অনুরাগী।

অন্যান্য বন্ধুদের মত মদ খায় না। সিনেমা খেলা রাজনীতি আর মেয়েদের শরীর নিয়ে নোংরা আলোচনা করে না। রুচিতে ছিল চূড়ান্ত শুচিতা। কথা বলত, যথেষ্ট সংযত পরিচ্ছন্ন। অদ্ভুত সুন্দর বাচনভঙ্গীর জন্য তার প্রত্যেকটি কথা আমার মন ছুঁয়ে যেত। বলতে গেলে সেই সূত্রেই আমার ভাললাগা ভালবাসা।

দিব্যদা নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ বলতে পছন্দ করত।

সেই জগতটা কোথায়—কীসের? একদিন জিগ্যেস করতে উত্তর দিয়েছিল, ঘরের বাইরে, মুক্ত জগতে। পাহাড় সমুদ্র আকাশ মাটি অরণ্য আর প্রকৃতিতে। সীমান্ত রেখা ছাড়িয়ে।

উত্তরটা শুনে আমার চোখ দু'টো চিকচিক করে উঠেছিল। আমি বলেছিলাম, তেমন জগতেই তো আমিও যেতে চাই দিব্যদা।

দিব্যদার সঙ্গে সাগরতীর্থে স্নানে গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই আমার মধ্যে নানা পরিবর্তন আসছিল। ঠাকুর দেবতাদের বই পড়তে ভাল লাগছিল। অনেকরকম পুজো উপবাস শুরু করলাম। সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খেতাম। দীক্ষা না নিলেও দিব্যদাই গুরুদেবের মত হয়ে গেল। ওঁর উপদেশ যেন আমার কাছে মন্ত্রের চেয়েও বড় হয়ে উঠল।

—জপ তপ উপোস উপাচার পুজো তো অনেক করলাম। এবার তোমার জগতটাতে নিয়ে যাবে দিব্যদা? একদিন বললাম।

—কোথায় যেতে চাও? জিগ্যেস করল।

—তীর্থক্ষেত্রে।

—বেশ তাই হবে। আমার মাথায় হাত রেখে দিব্যদা কথা দিল।

—গিয়েছিলে? কোথায় গেলে? প্রিয়ঙ্কর জিগ্যেস করল।

—না, যাওয়া আর হল না। সীমা দীর্ঘশ্বাস ছড়ালো।

—কেন?

—দাদার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল বিত্তেশ দাস। বিত্তদা ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টের অফিসার। ইস্পাতের মত স্বাস্থ্য। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। সুন্দর নাক ঠোঁট। যেকোন মেয়ের কাছে লোভনীয় শরীর। আমার ওপর বিত্তদার দারুণ দুর্বলতা ছিল। আমার কিন্তু দিব্যদাকেই পছন্দ। বিত্তদার চোখ দু'টোয় ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত লালসার আগুন দেখতে পেতাম। তাকাতে ভয় করত। আমার কাছে খবর ছিল, নানা সূত্র থেকে বিত্তদা অনেক টাকা রোজগার করত। মোটর বাইকে দাদাকে নিয়ে রেসের মাঠে যেত। বড় বড় হোটেলে গিয়ে মদ খেত। হাজার রকম ফুর্তি-টুর্তি করত।

পাপ পুণ্যতে বিত্তদার দারুণ এলার্জি ছিল। অনীহা ছিল ঈশ্বরাধনায়। ধনসম্পদ বিলাস বাসনা দেহাদিতে তাঁর খুব আসক্তি। আমার তীর্থে যাওয়ার পরিকল্পনা শুনে দাদাকে বলল, ওই স্কাউন্ড্রেল দিব্যটার সঙ্গে বোনকে তীর্থে পাঠাবি ? আশ্চর্য। আনকালচারড গেঁয়ো ভূতটার গায়ের গন্ধে রীতিমত বমি আসে। কেন যে গরীবের বাচ্চাটাকে এত ইমপর্টেন্স দিস বুঝি না। সীমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। দেখে নিস, এরপর তোকেও কোনদিন লোটাকম্বল ধরাবে।

ব্যাস্, তারপর থেকেই দাদা দিব্যদাকে এড়িয়ে চলতে থাকল। শেষ দিকে তো বিত্তদার কথায় কানভারীতে দিব্যদাকে দেখতেই পারত না। খুবই দুর্ব্যবহার করত। আমার কষ্ট হত। দিব্যদাকে আমিই আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম।

—ঠিক করনি। দিব্যেন্দুর ওপর তুমি অবিচার করেছো। প্রিয়ঙ্কর সীমাকে অভিযুক্ত করল।

সীমা নিজেকে অপরাধী বলে মেনে নিতে চাইল না। বলল, শেষটুকু শুনে তবে তো বিচার করবে।

—বেশ বল শুনি।

—আসলে মদের ওপর আমার দাদার দারুণ দুর্বলতা ছিল। ওই মদ খাইয়েই বিত্তদা দাদার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। বাড়ির সকলের জন্য দামী দামী নানা প্রেজেন্টেশান নিয়ে আসত। মাছ মুরগি কাজুবাদাম আরো কত কিছু যে নিয়ে আসত। সেই সঙ্গে মদের বোতল থাকবেই থাকবে। বিত্তদাকে দু'চারদিন না দেখলেই বাড়ির সকলে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ত। বিত্তদার সঙ্গ ছাড়া দাদার এক মুহূর্ত ভাল লাগত না। অপূর্ণ বোধ করত।

আমার দাদা কিন্তু এমনটি ছিল না। দিব্যদার স্কুলের মাস্টারী ছেড়ে জুতা কারখানায় অফিসারের চাকরিটা নেয়ার পর থেকেই কেমন যেন পাল্টে গেল। অর্থ-অহংকারে ক্ষমা পরোপকার পরম সহিষ্ণুতা গুণগুলি হারিয়ে গেল। ঐশ্বর্যগর্বে মোহান্ধ কামান্ধ পুরুষের মত কারণে অকারণে মাথা গরম করে ফেলত। আমি ভয় পেয়েছিলাম, যদি দিব্যদার কোন ক্ষতি করে বসে।

তবু, একদিন সাহস করে বললাম, দিব্যদার মত তুইও তো একদিন স্কুল মাস্টারই ছিলি দাদা। তবে কেন, ওঁকে এত অবজ্ঞা করিস ?

—ওর ওপর তোর অগাধ শ্রদ্ধায় আমার রাগ হয় না। তাই বলে, শালা আমাদের সংসারের গার্জেন হয়ে দাঁড়াবে তা টলারেট করা যায় না। ছেলেটা তো রীতিমত ওর পরামর্শেই চলতে শুরু করেছে। সব ব্যাপারেই দিব্যকাকুর দৃষ্টান্ত দেখায়। বাপ হয়েও আমি যেন ফালতু।

এছাড়াও অন্য কারণ আছে। দিব্যদার মধ্যে যে অগ্নিসম্ভাবনা ছিল সে সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সজাগ সচেতন করার চেষ্টা করেছিলাম। অর্থাৎ কিনা, যথাসময়ে ঘরে ফেরার অভ্যাস করা। ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করা, মাথার চুলে তেল দেয়া, কমতি চা সিগারেট খাওয়া এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরায় বাধ্য করার প্রচেষ্টা ছিল। আরো হাজারো রকমের পরোয়ানা, দোষত্রুটির ওপর নজরদারী লেগেই থাকত।

আমার প্রচেষ্টায় যতটা আন্তরিকতা ছিল, হয়তো ততটা নিঃস্বার্থ বিস্তৃতি ছিল না। দিব্যদার পথে নিজে চলা নয়; বরং তাকে আমার নিজের পথে টেনে আনতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ কিনা, একটা বনের পাখিকে পাড়িয়ে মনের খাঁচায় ধরে রাখার চেষ্টা ছিল।

দিব্যদা অসীমের তত্ত্ব শোনাত, আমি সীমার গুরুত্ব বোঝাতে চাইতাম। ফলত, দু'টি পরস্পরবিরোধী মতবাদে হামেশাই দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। শেষ পর্যন্ত আমার রাগ অভিমান কান্নায় দিব্যদা কিছুটা বিব্রত বোধ করত। কিছুদিন পরোয়ানা মতে ঠিকঠাক চলত। তারপর আবার যে কে সেই।

আমি সর্বক্ষণ ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতাম। দিব্যদা নিয়ত ঘর ছাড়ার ফন্দি আঁটত। বলত, আমি যেন ক্রমশঃ খাঁচার পাখি হয়ে যাচ্ছি।

হামেশা এরকম কথা শুনতে কার বা ভাল লাগে! নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে একদিন জিগ্যেস করলাম, প্রায়ই বলা এই কথাটার অর্থ কি?

—এই যে তোমার মন জোগাতে, তোমার ভাবনা ভাবতে গিয়ে আমার ডানা দু'টো ভারী হয়ে যাচ্ছে। আমি ক্রমশই নিষ্প্রভ নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছি। ভালবাসা যে আমার শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়তো কবেই দেখতে পেতে, আমি নিরুদ্দেশ যাত্রী হয়ে গেছি। আমার সেই জগতটা যে ভীষণভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

দিব্যদার মুখের কথাগুলি দারুণ করুণ শোনাল। যেন কাজলধোয়া জলের মত তার মনের ভেতরকার ব্যথাটা গলে গলে ঝরছিল। আমি ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। আমার নিরুত্তেজ মনে তীক্ষ্ন আঘাত লাগল। তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীর মনে একটা কাঁপন সৃষ্টি করল। আমি তীব্র অপমানবোধে কুঁকড়ে গুটিয়ে গেলাম।

এরপর সীমা আরো কীসব বলেছিল প্রিয়ঙ্কর তা শোনেনি। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে বুঝতে পেরেছে, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই ওদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রিয়ঙ্করের অনুমান, সবশেষে সীমা হয়তো বলেছিল, জানো

আজকে স্বামী সংসার নিয়ে সুখে থেকেও মাঝে মাঝে হঠাৎ দিব্যদাকে দেখতে খুউব ইচ্ছে করে। ভাবি, সেই আত্মসুখে চরম উদাসীন আপনভোলা পুরুষটি এখন কী করছে? গান আবৃত্তি ছবি আঁকা আর লেখায় কী মন দিয়েছে? নাকি পাহাড় সমুদ্র আকাশ মাটি আর তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন থেকে শরীরের ওপর কী অত্যাচার অবহেলা করেই চলেছে?

এমনটিই হয়ে থাকে। প্রিয়ঙ্করও তার প্রথমা স্ত্রী সুধার কথা ভাবে। তার চেয়েও অনেক বেশি করে মনে পড়ে, সুধা নামে একটি চঞ্চল উচ্ছল জেদী অভিমানিনী মেয়েকে। নিতান্ত ছেলেমানুষী যার মন। একটু বাঁধাবন্ধনহীন অসংযত বটে। ভাবে, সে তার নতুন স্বামীর ঘর ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পেরেছে কিনা।

সবার অমতে সুধাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল প্রিয়ঙ্কর। আগে থেকে বিয়ের অনুমোদন চাইতে বাবা তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, কখ্‌খনো না। ওদের বংশ পরিচয় ভাল না। অনেক কেচ্ছা কাহিনী আছে।

মা কিছুটা নৈরাশ্যে বিমর্ষ হয়ে স্বাভাবিক শান্ত জবাব দিয়েছিলেন, মেয়েটাকে ওর ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি তো বাবা। বড্ড ডানপিটে। লাজ লজ্জা বলতে কিচ্ছু নেই। কেমন যেন পুরুষালী ভাব। মোটেই বয়স মেনে চলে না। আদরে বাঁদর হওয়া মেয়ে ও আবার কীসের সংসার করবে!

বন্ধুরা অন্য সুরে কথা শুনিয়েছিল, দেখে নিস ওই মেয়ে তোকে আদৌ বিয়ে করবে না। ভাল রেজাল্ট করার ধান্ধায় তোর সঙ্গে ভালবাসার ভান করছে। আর দশজনের মত তোকেও খেলিয়ে ছেড়ে দেবে। ড্রিঙ্ক ডান্স ড্রামা নিয়ে ওদের হাই সোসাইটির জীবন। ভালবাসা ওদের কাছে একটা মামুলী অ্যাক্সিডেণ্ট। বিয়ের সেণ্টিমেণ্টটা থাকে না বললেই চলে। তাছাড়া, তোর মত একজন গেঁয়ো গোবেচারা অধ্যাপকের কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে।

আরও নানারকম কথা। হরেক অপ্রিয় মন্তব্য। সবগুলো যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে বিচার করা তা নয়। তাতে হিংসা ঘৃণা বিদ্রূপ যেমন ছিল, অহেতুক কান ভারী করা ভাঙ্‌চি দেয়াও ছিল।

সেসব কোন কথাকেই আমল দেয়নি প্রিয়ঙ্কর। জিত্‌তে হবেই—এখন একটা নেশায় যেন পেয়ে বসেছিল।

আসলে, সুধার দেয়া একটা প্রতিশ্রুতি মাথার ভেতর তখন রীতিমত পোক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল। সুধা বলেছিল, দেখে নিও প্রিয়দা, একটু সময় পেলে আর তুমি সাহায্যের হাত বাড়ালে আমি ঠিক তোমার মনের মত হয়ে উঠতে

পারব। বিশ্বাস কর, এই বিলাসী জীবনে আমি বড় ক্লান্ত। পারবে না আমাকে মুক্ত করে নদী প্রকৃতির মত জগতে নিয়ে যেতে? তা নাহ'লে আমার চেয়ে তুমি বড় কীসে! তোমার ওপর শ্রদ্ধা আসবে কোত্থেকে।

সুধার ওই প্রতিশ্রুতিভরা কথাগুলি ছিল সবচেয়ে বড় ভরসা।

বলতে গেলে, জীবনের সঙ্গে বাজী রেখেই প্রিয়ঙ্কর বিয়ে করেছিল। বাবা ধরে নিলেন, মোহতে ছেলের পদস্খলন হয়েছে। বন্ধুরা বলাবলি করল, প্রিয়ঙ্কর জেনেশুনে বিষ পান করল। একমাত্র মা বিয়েটা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, সুখে থাক।

তারপর তের মাসের দাম্পত্য জীবনে একটুকু সুখের জন্য প্রিয়ঙ্কর নিরন্তর মাথা কুটেছে। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে, সুখ বলে বস্তুটার পুনরাবৃত্তি নেই। সুখ আর শান্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সীমিত। ঠিক যেন সুধা আর তার মধ্যেকার অসমধর্মী সম্পর্কের মত। দু'জনে যেন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের।

সুধা সুশ্রী সুন্দরী। চেহারায় দারুণ চটক চমক। সেজন্য অহংকারের অন্ত নেই। ধনী বাপের আদরের মেয়ে বেজায় তুখোড়। উগ্র আধুনিকা। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। তার অসংযমী পোশাকের ফাঁকে আর চাহনিতে এমন একটা মাদকতা আছে যা সহজেই যে কোন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

এসবের কোনটিই প্রিয়ঙ্করের কাছে হৃদয়গ্রাহী ছিল না। স্ত্রী বলতে সে এমন একজনের স্বপ্ন দেখত যার ভেতর শান্ত সলজ্জ নম্রতা থাকবে। বিনয়ী হবে। সহজ স্বাভাবিক মিষ্টি চেহারার একজন স্ত্রী হবে।

প্রিয়ঙ্কর ভেবেছিল, সুধা আধুনিক বেলজ্জ ভোগ বিলাস থেকে কচি ঘাসের সবুজে একদিন নিশ্চয়ই নেমে আসবে। মুক্তো বিন্দু শিশিরের ওপর রোদ্দুরের আলোর মাহাত্ম্য বুঝতে শিখবে। সেজন্য ওর দেওয়া প্রতিশ্রুতিটা ওরই কানের কাছে নিরন্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনিয়ে বলত, উড়ন্ত উচ্ছ্বসিত বর্ণালী কল্পলোকে অনেক তো ভাসলে। এবার ডুব দাও গভীরে। 'সুখ' আর 'শান্তি' দুর্লভ মহামূল্য রত্ন বিশেষ। এ রত্ন উপহার দেয়া নেয়া যায় না। নিজেদের প্রচেষ্টাতেই পেতে হয়। কেন যে বোঝ না, ঘাম রক্ত চোখের জলের ভালবাসা 'অমূল্যরতন'। জাগতিক অন্য যে কোন বস্তুমূল্য ম্লান তার কাছে।

যদিও প্রিয়ংকরের বিশ্বাস, তার যা কিছু শক্তি তা অসম্ভব কষ্ট সহ্যগুণে; নীরবতায় নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায়। দারিদ্র্য তার অহংকার অলংকার। তবু সহ্যেরও তো একটা সীমারেখা আছে। সুধা রেগে গিয়ে যখন নীচ বেইমান ইতর ভিখিরী মিথ্যেবাদী গেঁয়ো-ভূত ছোটলোক ইত্যাদি এজাতীয় অশ্রদ্ধার শব্দ

ব্যবহার করত প্রিয়ংকর সরোষে শুধু ছোট্ট মন্তব্য করত, অসহ্য। শেষের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে বলত, এভাবের জোড়াতালির সংসার জতুগৃহের মত। অসহ্য। এভাবে কোনমতেই চলতে পারে না।

—তাহলে আমাকে কী করতে হবে বলতে পার? অভিনয়-ক্লাবে যাবার মুখে সুধা একদিন উত্তেজিত প্রশ্ন করে বসল।

প্রিয়ংকর বুঝতে পারল, সুধা এবার লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে চাইছে। যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে উত্তেজনা আয়ত্তে রেখে জবাব দিল, তোমার ওই অর্ধনগ্ন পোশাক ক্লাব পার্টি ড্রিংক ডান্স ড্রামা এসব ছাড়তে হবে। আমার স্ত্রী হিসেবে ওগুলো খুবই বেমানান।

—ভালবেসে বিয়ে করা মানে দাসখত্ লিখে দেয়া নয়। আমি তোমার কেনা কোন বাঁদীও না যে তোমার হুকুম মতে চলতে হবে।

শুনে আচমকা আঘাত পেল প্রিয়ংকর। অনেক গভীরে তোলপাড় করে তুলল। সুধা কী তাহলে মুক্তি চাইছে? বিবাহ বিচ্ছেদ! ইদানীং অবশ্য রাগের মাথায় পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়ার হুমকী দিচ্ছিল মাঝেমধ্যে। অনুযোগও দেয়, ওর জীবনটা নাকি নানা নিয়মে বেঁধে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। রাগলে সে তো অনেক কিছুই বলে থাকে। পরে ঠাণ্ডা মাথায় অনুশোচনাও করে।

কিন্তু এবার যেন প্রিয়ংকরের কাছে অন্যরকম মনে হল।

—তা না হোক, স্বামীর অধিকার নিয়ে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক কিছুই নির্দেশ দিতে পারি?

—অর্থাৎ, আমার নিজস্ব বলতে যা কিছু সব ছাড়তে হবে, এই তো নির্দেশ?

প্রশ্নটার ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল।

প্রিয়ংকর খানিকটা বজ্রদৃঢ়তা দেখাবার চেষ্টা করল।

—ঠিক তা নাহলেও বিয়ের আগে প্রায় ওরকম একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলে। সেই মতেই চলা উচিত নয় কি?

—চেষ্টা তো করছি। না-পারলে কি করব। ড্রিংক ডান্স অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। অন্তত একটা কিছুতো নিয়ে থাকতে হবে। নিজের বলতে যা কিছু সব বিসর্জন দিয়ে বাঁচার কোন অর্থই হয় না।

দু'জনে আরো অনেক কথা হল। বোঝাপড়ার কথা, বিতর্ক। কিন্তু কিছুতেই কোন সমঝোতা হল না। প্রিয়ংকর বুঝতে পারল, সুধাকে নিজের মনের মত করে গড়ে নেয়ার প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে।

বলতে গেলে সেদিন থেকেই দু'জনের সম্পর্কে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়। পরস্পর বিস্তর ব্যবধানে দূরে সরে যেতে থাকল। তিক্ততার বিষাক্ত বাতাস আচ্ছন্ন করা

দু'জনের মাঝে একটা উঁচু দেয়াল সৃষ্টি হল। তারপর একসময় দু'জনেই সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাইছিল।
প্রিয়ংকর যেন নদী পারের একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল। বিকেলের ম্লান রোদ্দুরে বিদায়ের খেয়া যেন অপেক্ষা করছিল। দিনের শেষে কী হয়? হিসেব-নিকেশ। সুধা সেই হিসেবই মেলাচ্ছিল। সে এবং তার বাপের বাড়ির তরফে এযাবত প্রিয়ঙ্করের জন্য কতটা কী দেয়া হয়েছে করা হয়েছে তার হিসাব। বিনিময়ে প্রিয়ংকর?
একজন অকৃতজ্ঞ পুরুষের প্রতি সুধার মনে ঘৃণার পাহাড় জমে উঠছিল। সেই পুরুষটির প্রতি যাকে সুধা শ্রদ্ধা করত। শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা এসেছিল। তারপর বিয়ে হল। শ্রদ্ধা উবে গেল। পরে অশ্রদ্ধা করতে শিখল। অসম্মান অপমান করতে করতে ভালবাসা হারিয়ে গেল।
প্রিয়ঙ্কর একদিন বলল, সত্যিকার ভালবাসা ঘৃণা করতে শেখায় না সুধা। ভালবাসায় প্রতিশোধস্পৃহা জাগে না। অপরকে আঘাত দিয়ে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশে ইচ্ছে করে না। ভালবাসা কাছে টানে। অহিংসার উদারতায় সব কষ্ট নিজের বুকে ধরে নেয়। ভালবাসায় আঘাত পেয়েও মানুষ বিনম্র শান্ত থাকে। স্বইচ্ছায় হার মেনে নিয়ে পরাজিত অধীশ্বর হয়। আমি তো হামেশাই বলতাম, সব জয়, জয় নয় সুধা। হারাতে হারাতে দেখবে, তুমি একদিন আসল মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলবে। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।
সুধা এতটা ভাবেনি। প্রিয়ঙ্কর যে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এত অল্পেতেই তৎপর হবে তা স্বপ্নেও ছিল না। শেষের পর্বে সুধা যথেষ্ট সংযমী শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে হয়ত অব্যক্ত আবেদনই তুলে ধরতে চাইছিল। যার অর্থ, আর একবার ভেবে দেখলে হয় না? এই তো আমি নিজেকে পাল্টে নেবার চেষ্টা করছি।
প্রিয়ঙ্কর সব বুঝতে পারল। একদিন সুধাকে ডেকে কাছে বসিয়ে বোঝাল, সত্যিকার ভালবাসা কখনও 'ভালবাসতাম' হয় না। আমরণ আমি তোমাকে ভালবাসব সুধা।
—সত্যিই যদি তাই, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছো কেন?
—দু'জনে দু'জনের মত বেঁচে থাকার বিনিময়ে ভালবাসাটা চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য।
—ঠিক বুঝলাম না।
ওহ্ অফসানা জিসে তকমীল্ তক্ লানা হো মুসকিন
উসে এক খুবসুরৎ মোড় দেকর ছোড়না আচ্ছা।

শাহীর লুধিয়ানভী-র শের শুনিয়ে প্রিয়ঙ্কর বোঝাল, যদি কোন কাহিনীকে বেশি দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তবে তাকে মাঝপথে সুন্দর কোন মোড়ে ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়ঃ।

তারপর বিয়ের তের মাস পরে মতৈক্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সেই থেকে বুকের ভেতর গোপন স্থানে প্রিয়ঙ্কর কাঁটাটা বয়ে বেড়াচ্ছে।

এতকাল বুকের ভেতর নিভৃতে শুধু একটা কাঁটাই ছিল। এখন নতুন আর একটা উপসর্গ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকাল প্রিয়ঙ্করের মাথার ভেতর একটা পোকাও হেঁটে বেড়ায়। পোকাটা সেদিন রাত্রে সীমার কাছ থেকে পাওয়া। সুধার কাঁটা আর সীমার পোকা—দুইএ মিলে প্রিয়ঙ্করের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠছে। পোকাটা মাঝেমধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। প্রিয়ঙ্কর আঁকাবাঁকা চিন্তার আঁক কষে। আর ঠিক তখনি কাঁটাটা তার অস্তিত্ব জাহির করে।

প্রিয়ঙ্কর ওদের সঙ্গে লড়াই করে। বেঁচে থাকার লড়াই। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে যায়। মনে হয়, বোধহয় কোন অন্ধকার গভীরে সে তলিয়ে যাচ্ছে। অনেক গভীরে—পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদম মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে চলেছে।

প্রায় নিষ্প্রাণ দেহটায় পোকা আর কাঁটার যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারে অতিষ্ঠ প্রিয়ঙ্কর তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে। সাহায্য প্রত্যাশায় নিঃসঙ্গ হয়ে সঙ্গ খোঁজে। একান্ত আপন প্রিয়জনদের হাতড়ে বেড়ায়। বিশেষ কোন একজনের সান্নিধ্যের প্রয়োজন বোধ করে। কাকে ডাকবে ভাবতে গিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। ঠোঁটের পাপড়ি দুটো ঈষৎ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

এইরকম বিশেষ মুহূর্তে সুধাই প্রথম কাছে এগিয়ে আসে। যেমনটি আসে লেখাপড়ার টেবিলে বিনিদ্র রাতে। বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রেরণা দেয়।

সুধা কাছে এলো। অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে খুব কাছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দু আর সীমাও এলো। প্রিয়ঙ্কর সুধার চোখে চোখ রাখল। সীমা তাকাল দিব্যেন্দুর দিকে।

প্রিয়ঙ্করের মনে হল, চারজনে মিলে তারা যেন বিরাট এক আবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ছোটবড় বৃত্তে—চক্রাকারে। তারপর ছিটকে গিয়ে যে যার নির্দিষ্ট পথ ধরে চলছে। কেউ কাউকে ধরতে পারছে না। কোনকালেই তা সম্ভব নয় জেনেও প্রিয়ঙ্করের হাত সুধার দিকে প্রসারিত। সীমা হাত বাড়িয়ে ছুটছে দিব্যেন্দুর দিকে। সীমা যে এখন আমার স্ত্রী! ভাবতে গিয়ে দারুণ উত্তেজনায় প্রিয়ঙ্কর চমকে ওঠে। চোখ মেলে চেয়ে দেখে, সীমা তার ঘাম জবজবে দেহটাকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

নীল নীলা

পঞ্চদশী রাজকন্যাটি বড়ই দুঃসাহসী। সে একাই ঘোড়ায় চড়ে বনভূমি ভ্রমণে বেরিয়েছে। এই বয়সের কুমারীর হৃদয়মন গোপন জলাশয়। সেখানে চঞ্চলতা উচ্ছলতা তির তির কাঁপন। ঠোঁটে দুষ্টু মিষ্টি হাসি। চোখে স্বপ্ন রঙীন। কীটপতঙ্গের মত ওড়াউড়ি করতে চায়। প্রকৃতি ঋতু বৈচিত্র্য ভাল লাগে। ভাল লাগার গর্ভে ভালাবাসা জন্ম নেয়।

সে ঘুরে ফিরে দেখছিল। পাহাড় নদী ঝর্ণা সরোবর উপত্যকা। নির্মল আকাশ। বর্ণালী ফুল ফল পশু পাখি। সবুজ শস্যক্ষেত গাছ-গাছালি লতাপাতা। আরো অনেক কিছু। হঠাৎ বিশেষ একটি দৃশ্য তার নজর কেড়ে নেয়। সে থমকে ঘোড়া থামায়।

বিশাল বটগাছের ছায়ায় দীর্ঘদেহী এক রাখালপুত্র বসে আছে। বলিষ্ঠ সবল হাতে তার বাঁশের বাঁশি। বাতাসে উড়ছে দীর্ঘঘন চুল। গলায় ঝুলছে মাদুলি। তার চওড়া কপাল তীক্ষ্ণ নাক চোখ ঠোঁট। গড়াপেটা শরীরে বেআব্রু প্রশস্ত বুক। সে আপন মনে বিভোর হয়ে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। খেয়ালই নেই, কখন যে ঘোড়া থামিয়ে রাজকন্যা এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখল, অবাক হয়ে বাঁশির সুর থেমে গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সমুদ্রের মত গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

সামনে ঘোড়ার ওপর বসে আছে, অপরূপা এক নবীনা সুন্দরী। ঝিলিক দেয়া তার জ্যোৎস্না তনু। গলায় ত্রিবলী রেখা। বাঁধুলি ফুলের মত রক্তিম ঠোঁট। কুন্দ ফুলের মত দাঁত। কাজলটানা খঞ্জন পাখির মত চোখ। মসৃণ টিকোল নাক। হরিণীর মত লাজুক চাহনি। দোলায়িত সুন্দর দীর্ঘ বেণী। পায়ে রত্ন নূপুর। রত্নালঙ্কারে ভরা সর্বাঙ্গ। দেখতে বড়ই স্নিগ্ধ নিষ্পাপ মিষ্টি-মধুর। একী দেখছে সে—আকাশপরী নাকি স্বর্গের দেবী!

রাখালপুত্রের শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বয়ে যায়। ঝির ঝির বৃষ্টির শিহরণ লাগে। পাতায় পাতায় দোল দিয়ে যায়। কুঁড়িগুলি পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। লক্ষকোটি মৌমাছি গুনগুন করে। পাখিরা সমবেত

গান গায়। ঝর্ণা জলতরঙ্গ বাজায়। সে ভাবে, হয়ত তার বাঁশির সুর শুনেই ঘোড়া থামিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মোহিত হয়ে বুঝিবা কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।
সে গাছের তলা থেকে ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মিষ্টি সুরে জানতে চায়,
'তুমি কে?'
'রাজনন্দিনী নীলা। তুমি?'
'রাখালনন্দন বংশী।'
'কি বিচ্ছিরি নাম তোমার। বাঁশি কখনও মানুষের নাম হয়?'
নীলা ঠোঁট বাঁকিয়ে চটুল চপল হাসে। ঠোঁট ভুরুর ভঙ্গীতে কটাক্ষ ফুটে ওঠে। ঘোড়া থেকে নেমে মুখোমুখি দাঁড়াতে বংশী লজ্জা পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর ভূমিতে দৃষ্টি নামায়। পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে থাকে। নীলা তার ঝলমল রাজপোশাকের ভেতর থেকে নীল পাখির একটা পালক বের করে। বংশীর চুলে কাপড়ের বাঁধনে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এখন থেকে তোমার নাম নীল। বংশী তো তোমার হাতে।'
নীল সঙ্কোচে গুটিয়ে গেল। নতুন নামে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। রক্তকণিকায় স্রোত বয়ে যায়। নীল পাখির পালক নয়তো যেন মুকুট। নিজেকে রাখাল রাজা মনে হয়। নীলাকে ভাল লাগে। নীলা যেন তার রানী। একটু পরেই হয়ত ঘোড়াটার ঢাউস দু'টো পাখনা গজাবে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তারা তখন দু'জনে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে যেখানে খুশী উড়ে যেতে পারবে। নীল যেন স্বপ্নময় এক রূপকথার জগতে পৌঁছে যেতে থাকে।
'তুমি এত ভীতু কেন নীল? পুরুষের কী এত ভীতু হওয়া সাজে?'
নীলার ডাকে রূপকথা হারিয়ে যায়। সে শিশির ভেজা ঘাসের মত মুখ তুলে লাজুক হাসে। হরিণচোখে তাকায়। নীলার চোখের তারায় চোখ মেলায়। কী বলবে ভেবে পায় না। অথচ, আনন্দে বুকের ভেতর ঢেউ খেলে যায়। সোনা ঝরা রোদ্দুর ঝলমল করে।
'তুমি কোথায় থাক? আকাশে নাকি স্বর্গে।'
নীল কৌতূহলী হয়ে ওঠে।
'ধ্যেৎ। বোকা গেঁয়ো ভূত কোথাকার।'
নীলা পাকা ধানের রিন্‌ ঝিন্‌ শব্দ ছড়িয়ে হেসে লুটোপুটি খায়। রোমকূপে ঝড় খেলে যায়।
'রাজনন্দিনী তো মানুষ। তুমি কখনো রাজপ্রাসাদ দেখনি? আমি সেই রাজপ্রাসাদে থাকি।'

নীল আবার লজ্জা পায়। ঢল কলমির মত ঘাড় দুলিয়ে জানায়, সে কখনো রাজপ্রাসাদ দেখেনি।
'কোথায় তোমার রাজপ্রাসাদ ?'
'ওইতো টিলার ওপারে।'
'কেমন দেখতে ?'
'কেমন আবার। পাহাড়ের মত উঁচু। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট বিরাট পাথরের ঘরবাড়ি। বড় বড় দরজা জানলা। নকশাকাটা সাজগোছ।'
'কী আছে সেখানে ?'
'রত্ন সিংহাসন রাজা রানী রাজকন্যা রাজপুত্র। পণ্ডিত জ্ঞানীগুণী মন্ত্রী সৈন্যসামন্ত কোটাল ঘোড়া হাতি অনেক লোকজন। মণি-মাণিক্য ধনসম্পদ। ফুলবাগিচা ফোয়ারা জলসাঘর। আরো কত কিছু। তোমাকে কী করে এতসব বোঝাব। তুমি যাবেতো একদিন নিয়ে যাব। যাবে তুমি ?'
'না।'
'কেন ?'
'শুনে ভীষণ ভয় করছে।'
'বোকা হাঁদা। ভয় কীসের ? আমার সঙ্গেতো যাবে।'
'শুনেই বুঝতে পারছি, সেখানে ধনী লোকেরা থাকে। আমি যে ভীষণ গরীব।'
'তাতে কী হয়েছে। তোমার যে বীরপুরুষের মত সুন্দর চেহারা স্বাস্থ্য আছে। কী সুন্দর নাক চোখ বুক ঠোঁট। কত লম্বা তুমি। যেন রাজপুত্তুর। দেখে নিও, তুমি একদিন নীল রাজাও হবে।'
'সত্যি ?'
'সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি। তোমার চেহারা দেখে আমার দারুণ ভাল লেগেছে। তাইতো ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি।'
নিজেকে রাজপুত্র ভাবতে কার না ভাল লাগে। অথচ, নীল খুশি হতে পারল না। চোখ ছল ছল করে ওঠে। বিষণ্ণ করুণ মুখে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে। নীলা হতবাক হয়ে দৌড়ে কাছে ছুটে যায়। হাত ধরে ফেলে।
'তুমি রাগ করলে নীল ?'
'কই না তো।'
'তাহলে মুখ ভার করে চলে যাচ্ছ কেন ? কী এমন কষ্ট দিলাম ? তোমাকে বলতেই হবে।'
'রাজপুত্তুরতো কতই আছে। যাওনা তাদের কাছে। ভেবেছিলাম, আমার বাঁশির সুর শুনে বুঝি তুমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলে। এখন দেখছি, ভুল করেছি।

বাঁশি শুনতে তোমার ভাল লাগে না বুঝি ?'
'ভাল লাগে তো। খুউব ভাল লাগে। দেখি তোমার বাঁশিটা।'
নীলের হাত থেকে বাঁশিটা ছিনিয়ে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করে দেখে, অনেক কালের পুরনো। তেল চিটচিটে চটা ঘষা। অপছন্দ বাঁশিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা ভাল বাঁশি দেব। সোনায় বাঁধানো বাঁশি।'
'সোনার বাঁশিতে কী সোনার সুর ঝরে ?'
'তাতো জানিনা।'
'তা না হলে বাঁশের বাঁশি ফেলে সোনার বাঁশি নেব কেন !'
'বেশ তাহলে দেব না।'
দু'জনে নানান কথায় কথায় ঝিকমিক এক চিলতে রুপোলী নদীর ধারে এসে পড়ে। হঠাৎ টুকরো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। বাতাসে মিহি মসৃণ বৃষ্টিকণা ওড়ে। ঝিরঝির ঝরে। যেন ঘোমটার আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দেয়। নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। সাতরঙা রামধনু দেখা যায়। ফুরফুরে শীতল বাতাসে শিরশির শীত করে।
'তোমার গায়ে তো কোন জামা নেই। শীত করছে না ? এই নাও আমার ওড়নাটা। পরে এমন একটা পোশাক দেব যা পরলে দারুণ শীতেও খু-উ-ব গরম লাগবে।' নীলা বলে।
'আমার শীত করছে না। তুমি যে পোশাকের কথা বলছ সেকি দিনে রোদ্দুর রাতে কাঠের আগুনের চেয়েও বেশি গরম ? নাহলে কেন নিতে যাব।' ওড়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে নীল বলে।
নীলা কোন জবাব দিল না। দু'জনে কাঁকুরে পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে। আবীর রঙা ধুলো আর নুড়ি কাঁকর কাঁটা ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ। কোথাও কোথাও তপ্তও বটে। নীলের পায়ে কোন জুতো নেই। হয়ত কষ্ট হচ্ছে ভেবে নীলা হাত ধরে ঢাল পথে নামে। সবুজ ঘাসের নরম গালিচার ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে।
কাঁটালতা ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে দু'জনে একসময় ছায়ানিবিড় পথ ধরে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় শঙ্খচিল একঝাঁক বনটিয়া আর সাদা বকের সারি। নীলা বলে, 'তোমার বুঝি জুতো নেই ? আমি তোমাকে দেব। রুপোর জরির নকশাকাটা সুন্দর জুতো।'
'আমার পায়ে কোন গরম লাগে না। নুড়ি কাঁটাও ফোটে না। জুতো দিয়ে কী হবে।' কথাটা বলেই হঠাৎ নীলার মণিবন্ধে নীলের নজর পড়ে যায়। সোনালি চকচকে বস্তুটা ভারী সুন্দর দেখতে। ভেতরে উজ্জ্বল সবুজ আলো

জ্বলছে নিভছে। সোনালি এক জোড়া রেখা চলছে ফিরছে। বড় বিস্ময়কর।
'তোমার হাতে ওটা কী?'
'ঘড়ি। তোমার পছন্দ? তাহলে এটাই নাও।'
'কী হবে?'
'কত সময় হল বুঝতে পারবে।'
'আকাশ সূর্য দিনের আলো দেখেই আমি সময় বুঝতে পারি।'
নীলা মনক্ষুণ্ণ হয়। ভাবে, সবাইতো পেতে ভালবাসে। নীল বোকা নাকি? যাই হোক না কেন দরিদ্র হলেও লোভী তো নয়। সত্যিইতো যা তার প্রয়োজনে লাগবে না তা নিয়ে কি করবে সে। তেমন বস্তু দিয়েই বা কী লাভ। এমন কিছু দিতে হবে যা নীল ব্যবহার করবে। ভালবাসার স্মৃতি হয়ে থাকবে। কী সে জিনিস হতে পারে সারাপথ ভাবতে থাকে।
ঘন গাছ-গাছালির বুনোট পাতার ফাঁক দিয়ে চিকণ রোদ্দুর ছিলকে গায়ে এসে পড়ে। সরু বনপথের দু'ধারে ফুটে থাকা ছোট ছোট লাল নীল বেগুনি ফুল দোল খায়। চড়ুই টুনটুনি বুলবুলি মৌটুসী পাখিরা তিড়িং বিড়িং উড়ে বেড়ায়। শিস দেয় নাম না জানা পাখি।
দু'জনে একটা পর্ণকুটিরের কাছে এসে দাঁড়াল। নীল এখানে থাকে। বাবা গেছে গরু চরাতে। মা এখন বনে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করছে। দরিদ্র কুটির হলেও ঘরদোর উঠোন যেন ছবির মত। মসৃণ চিত্রিত দেয়াল। তকতকে নিকোন উঠোন। চারদিকে তাজা সবুজ। নদীতে ডিঙি নৌকা ভাসছে একটা। হাজার রকম ফল ফুলের বাগান। বাগানে রকমারি ফুল ফুটে আছে। ফল ফলেছে অজস্র। বাতাসে সুঘ্রাণ ভাসছে। উড়ছে মৌমাছি। রংবেরঙের ফড়িং প্রজাপতি। জারুল গাছের ডালে লাফাচ্ছে কাঠবিড়ালী। নাচগানের আসর বসিয়েছে চড়ুই ছাতার পাখি।
নীলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে অভিভূত। যেন স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছে। রাজ-প্রাসাদের কথা মনেও পড়ে না।
'ফুল ভালবাস নীলা?'
'ভীষণ ভালবাসি।'
'তাহলে যত খুশি তুলে নাও।'
'না। তুমি নিজের হাতে তুলে দাও।'
'কোন রঙটা বেশি পছন্দ?'
'হলুদ। তোমার?'
'দুধে আলতা রঙ—গোলাপী। তুমিও তো তাই।'

'তাহলে দু'রকম মিশিয়েই দাও।'
নীল আগেই কিছু গন্ধ স্বাদে ভরা মিষ্টি ফল পেড়েছিল। একগুচ্ছ ফুল আর ফলগুলি নীলাকে এগিয়ে দেয়।
সে কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করে অভিযোগ জানায়, 'ভালবাসা কী শুধু দেওয়াতেই? নিতেও হয় যে। আমি যা কিছু দিতে চাইছি এড়িয়ে যাচ্ছ। যদি একটা সুন্দর বাদশাহী মোমদানি দেই? ঘরময় দিনের মত আলো ছড়াবে। নেবে না তুমি? বল কী অজুহাতে এড়াবে?'
'মোমদানি আর কতটুকু আলো দেবে—চাঁদের চেয়েও বেশি? অজ্ঞানতাই অন্ধকার। পরিষ্কার মনের উদার দৃষ্টি থাকলে সবকিছুই আলোময় মনে হয়।'
কী বোঝাতে চাইছে নীল? এক রাখালের অশিক্ষিত ছেলের মুখে জ্ঞানের কথা। কাকে? রাজনন্দিনীকে। কতবড় স্পর্ধা ধৃষ্টতা। নীলার আত্ম-অহংকারে আঘাত লাগল। বিরক্তি রাগ ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সর্পিণীর মেজাজে নীলকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে, 'ভালবাসার কাঙাল ভাবছো আমাকে? জাননা তুমি, কত রাজপুত্তুর পাগল আমার জন্যে। কীসের অহংকার তোমার? আমি ঘৃণা করি তোমাকে।'
'আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি। রাগতো দুর্বলের অস্ত্র। শান্ত সংযমীরা অনেক বেশি শক্তিশালী।'
নীল ধীর স্থির শান্তচিত্তে নীলার মাথার চুলে হাত রাখে। স্মিত শীতল হাসি ছড়িয়ে বলে, 'এই দেখনা নীল পালকটা। কত যত্ন আদরে রেখেছি। আকাশ নীল। সমুদ্রের জল নীল। তোমার চোখ নীল। অনেক কষ্টে বেঁচে থাকা আমিও নীল। তোমার দেয়া নীল পালকটাই আমার ভাল।'
নীলা যেন শরতের জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করে উঠল। ভালবাসা যে এত স্নিগ্ধ হতে পারে তাতো জানা ছিল না আগে! এবার রাগ ক্ষোভ দুঃখ নয়। বরং মুগ্ধ হয়ে যায়। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে পড়ে। পরম প্রীত সন্তুষ্টচিত্তে বলে, 'আমাকে ক্ষমা কর। রাজঐশ্বর্যে থাকা আমার ভুল অহংকারটা তুমি আজ ভেঙে দিলে। আমি নতুন জগতের আলো দেখতে পারছি। তুমি মহৎ পবিত্র মহার্ঘ। তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি নীল! আমাকে তুমি গ্রহণ কর।'
'তা আবার হয় কখনও?'
'কেন হয় না?'
'তুমি যে নীলা। শুনেছি, নীলা সকলের সহ্য হয় না। ভালবাসতে হয় দূর থেকে।'

———

প্রভাস ভদ্র লেখেন কম। যেটুকু লেখালেখি তা নিজের তাগিদেই। তাই তাঁর প্রতিটি লেখাই আন্তরিক সাধনার ফসল। তাঁর গল্পের দাবী কাহিনী পিপাসু পাঠকের জন্য নয়। তাঁর গল্পে জীবনের গভীরতর জটিলতা নিয়ে তথাকথিত দার্শনিক খেলায় মেতে ওঠা থাকে না। না-থাকে কোন নাটকীয় উপাদান। তিনি অভ্যস্ত, কিছু সহজ সত্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আমাদের চেনাজানা সংসারের মানুষজন নিয়েই তাঁর কারবার বেশি। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সহজ ভাবে নেয়া যেকোন একটি দু'টি দিন, মলিন উজ্জ্বল মুহূর্ত আর একান্ত গূঢ় কিছু ভাবনা তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয়। জীবন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সমান নৈপুণ্য। বক্তব্যকে নিপুণ ভাবে গল্পে ধরে রাখার শিল্পীসুলভ কৌশলটিতে সিদ্ধহস্ত বলেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির ব্যর্থতা অহমিকাকে সহজে ছুঁতে পারা যায়। তাঁর গল্পের ভাষা ঋজু বলিষ্ঠ ও শাণিত। এ ভাষা অনেক সাধনার ধন। তাঁর গল্পের বিষয় ভাষা চরিত্র ও স্টাইল ধার করা নয়। বরং মৌলিক লেখকসত্তার অধিকারী প্রভাসের অসাধারণ প্রতিভা অননুকরণীয়। একজন বক্তব্যধর্মী গল্প লেখক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়া প্রভাসের তৃতীয় সংকলনটির গল্পগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'নীল নীলা' বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সতেরটি অসামান্য অভিনন্দনীয় ভিন্নস্বাদের প্রেম ভালবাসার গল্প সংকলন।

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

He is a rising literary talent and a finished Artist.

মন্তব্যটি শ্রী প্রভাস ভদ্র সম্পর্কে
বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক অধ্যাপক
প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

প্রভাসের জন্ম : ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে
ওপার বাংলার ফরিদপুর জেলায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম.এ।
তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত :
ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিন 'প্রত্যয়',
বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী স্মরণিকা সংখ্যা
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকা।
প্রভাস আঁকায় ও মূর্তি গড়ায় পারদর্শী।
নানা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী।
যেসব পত্রপত্রিকায় এযাবৎ
তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে::
দেশ,:আনন্দবাজার, অমৃত, যুগান্তর,
দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, আজকাল,
বর্তমান, সত্যযুগ, সুকন্যা...
তাদের মধ্যে অন্যতম।
ইতিপূর্বে 'গল্প', 'স্বয়ং নিজের:প্রতিদ্বন্দ্বী'
সংকলন গ্রন্থ দুটিতে
একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

স্কেচ : সুধীর মৈত্র